খাওয়া দেখিয়া কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়াছে, রামকান্ত এ বিদ্রূপ সহ্য করিতে পারে না।

বাড়ী ফিরিয়া সে অতি গম্ভীরভাবে দাওয়ার একধারে খুঁটিতে ঠেস দিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল। ঘরের ভিতর হইতে রত্না স্বামীকে দেখিতে পাইয়াছিল। সমস্ত দুপুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সন্তর্পণে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া রত্না বাহিরে আসিল।

রামকান্ত তাহার পানে ফিরিয়া চাইল না, যেমন ভাবে বসিয়া পা নাচাইতেছিল তেমনই ভাবে পা নাচাইতে লাগিল।

চাপা স্বরে রত্না বলিল, "অমন করে বসে রইলে যে, হাত পা ধুলে না—তামাক খেলে না?"

রামকান্ত উত্তর দিল "না, খাব না।" রাগ যে অনেকখানি হইয়াছে সে জানা কথা।

রত্না জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ রাগ হওয়ার মানে—"

উদাস ভাবে রামকান্ত বলিল, "আমার খুসি,—খেতে ইচ্ছে নেই। জোর করেতো কেউ কিছু করাতে পারবে না।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমি আজ হতে ওবাড়ীতে শোব, আজ ওখানেই খাব। সারাদিন ভূতের মত খেটে রাত্রে না ঘুমিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। কি কান্না ছেলের—এক দণ্ড যদি চুপ করে"—

পুত্রের নিন্দায় কিশোরী মা একেবারে মুসড়িয়া পড়িল।

ছেলে কাঁদে—কিন্তু সে কি বরাবরই কাঁদিত? তাহার ছেলে না কি বড় ঠাণ্ডা সবাই এ কথা বলে। কেবল আজই তাহার অসুখ হইয়াছে বলিয়া রাত্রে সে মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠে। রত্না তাহাকে বুকে লইয়া সারারাত নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়ায়, পাছে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গে এই ভয়ে সে সদাই সন্ত্রস্ত।

ঘরের মধ্যে খোকা কাঁদিয়া উঠিতেই রত্না তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। জ্বলন্ত চক্ষে রামকান্ত তাকাইয়া রহিল। কচি ছেলেটার অন্যায় আবদার দেখিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই।

একটু পরেই রত্না ফিরিয়া আসিয়া দেখিল রামকান্ত চলিয়া গেছে।

স্বার্থপর রামকান্ত—বরাবর একাই সব কিছু দখল করিয়া আসিয়াছে—মায়ের সমস্ত স্নেহ এবং পত্নীর প্রেম ভালোবাসা। ভাগীদার এতদিন কেহই ছিলনা, হঠাৎ এই ছেলেটা কোথা হইতে আসিয়া জুড়িয়া বসিল, সে কেবল তাহাই ভাবে।

হিংসায় বুকটা জ্বলিয়া যায়। ওইটুকু একটা শিশু, লোকচিত্ত আকর্ষণ করিবার শক্তি তো কম নয়। হাসিয়া কাঁদিয়া সমস্ত বাড়ীটা পূর্ণ করিয়া ফেলিল, ইহাই না বিস্ময়ের কথা। কেবল বাড়ীই নয়, রত্নার অন্তর পর্য্যন্ত। আগে যে রত্নার কোনো কাজে এতটুকু ভুল ছিল না, এখন সেই রত্নার সব কাজেই ভুল হয়।

আগে ও পরে

রামকান্ত আপন মনে তামাক খাইতে খাইতে ভাবে স্ত্রী-গুলো বেশ ভালো কিন্তু মেয়েদের মা হওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ। মা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সব হারায়—স্বামীপ্রেম, সংসার, এমন কি নিজকে পর্য্যন্ত।

রামকান্তও ক্রমে নিষ্ঠুর হইতে আরম্ভ করে। এই যে ক্ষুদ্র শত্রুটী আসিয়া তাহাকে তাহার স্থানচ্যুত করিয়াছে, ইহাকে সে কোনো মতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

দিন কাটে—খোকা ভাল হইল এক রকম বিনা চিকিৎসাতেই। বেচারা মা কোথা হইতে শিউলীর পাতা, বেলের পাতা যোগাড় করিয়া তাহার রস খাওয়ানো,-রামকান্ত তাকাইয়া দেখে। হয় তো খোকার জন্যে এতটুকু করুণা জাগে, কিন্তু যখনই দেখে রত্না তাহাকে তাহার সম্মুখ হইতে লুকাইয়া রাখিতে চায় তখনই সে করুণাটুকু কর্পূরের মত উড়িয়া যায়।

খোকা যখন দুই এক পা হাঁটিতে গিয়া পড়িয়া যায় তখন রামকান্ত হয়তো তাহাকে ধরিলেও ধরিতে পারিত কিন্তু রত্না হাতের সব কাজ ফেলিয়া এমনভাবে খোকাকে তুলিয়া লয় যাহাতে রামকান্তের আর উঠিবার প্রবৃত্তি হয় না।

রত্না স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া খোকাকে সর্ব্বদা বুকের আড়ালে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, কোনওক্রমে স্বামীর সামনে তাহাকে যাইতে দিতে চায় না।

কিন্তু দুর্ব্বিনীত খোকা শাসন মানে না। হাঁটিতে ও দুই

একটা কথা বলিতে শিখিয়া ভারি মুস্কিল হইল। হামা দিবার সময় বরং ভালো ছিল, কোমরে একটা দড়ি দিয়া কোনও খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিত, কিন্তু হাঁটিতে শিখিয়া সে হাঁটিতে হাঁটিতে ঠিক রামকান্তের পিঠের উপর গিয়া পড়ে, দুইটী কুসুম কোমল কচি হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানা কাঁধের উপর রাখিয়া ডাকে—"বাবা—টু।"

সেদিনে আত্মবিস্মৃত রামকান্ত ছেলেটার তুলতুলে গালে চুমা খায় আর কি,—ঠিক এই সময় রত্না আসিয়া পড়িয়াছিল। রামকান্ত ছেলেকে একটা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়াছিল, ধমক দিয়াছিল—"ফের আমার কাছে আসিস নে খোকা, সব সময় আবদার।"

স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটা ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ক্ষুদ্র খোকা, মিলনের সেতু হইতে পারে নাই।

রত্না ঠিক বুঝিতে পারে না খোকা কি করিয়াছে, কেন রামকান্ত খোকাকে দেখিতে পারে না। রামকান্ত সকালে বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে সে যে-কোন জ্যোতিষী পায় তাহাকেই বাড়ীতে ডাকে, কোথাও কোনো সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইলে খোকাকে লইয়া সেখানে যায়। মাদুলি, কবজ, প্রসাদী ফুল বেলপাতায় হাত, গলা, ঘরের ছোট টিনের পেঁটরাটা ভরিয়া উঠে, তবু রামকান্ত পুত্রকে দেখিতে পারে না, তবু সে মুখ ফিরায়।

এ সব ব্যাপার রামকান্তের কাছে অনেক দিনেই অজ্ঞাত

ছিল হঠাৎ একদিন নিতান্ত অসময়ে বাড়ী ফিরিয়া দেখিতে পাইল রত্না কপালের উপর মাথার কাপড় টানিয়া এক জ্যোতিষীর সামনে বসিয়া ; খোকা দাঁড়াইয়া গম্ভীর মুখে জ্যোতিষীর কাণ্ড দেখিতেছে। রত্নার পাশে একখানা থালে স্তূপাকার চাল, গোটাকতক আলু ও পাঁচটা পয়সা আছে।

দুই এক কথাতেই রামকান্ত বুঝিতে পারিল, এ সব কেন, হাতের লাঠি আন্দোলন করিতেই জ্যোতিষী ঝুলি ঝোলা লইয়া নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

হাতের লাঠি ঘুরাইয়া রামকান্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল—"হুঁ, আমি কোথায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করে ফসল তুলি, আর উনি কি না সেই রক্ত জল করা চাল, পয়সা নিয়ে যত রাজ্যের সম্বন্ধীকে জুটিয়ে তাদের বিতরণ করেন। ফের যদি কোন দিন এ রকম দেখতে পাই, সেদিন লাঠি মেরে মাজা ভেঙ্গে দেব।"

রত্না নিঃশব্দে রহিল।

২

ধনীর ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে দরিদ্রের চক্ষু ধাঁধিয়া যায়।

ধনীর মোটর পথ দিয়ে চলিয়া যায়, পথ কাঁপে। দরিদ্র পল্লীবাসীরা সসম্ভ্রমে ও সতর্কে পথ ছাড়িয়া যায়। মোটর চলিতে পথের ধূলা কাদা ছিটকাইয়া লাগে তাহাদেরই কাপড়ে।

কিন্তু এযে চিরন্তন কথা, চিরন্তন ব্যাপার—বরাবরই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। ধনী সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া পথ চলে, দরিদ্র মাথা নত করিয়া পার্শ্বে সরিয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগ দরিদ্রের মনে লুপ্ত গর্ব্ব জাগাইয়া দিয়াছে, বিচার-প্রবৃত্তি আনিয়া দিয়াছে। দিন যত যায়, মানুষ অভিজ্ঞতাও পায় তত বেশী, আগেকার মত তাহারা ছোট বড় অনুশাসন মানিতে রাজী নয়।

তাহারা দেয় যথেষ্ট অথচ সে দেওয়ার নাম নাই। পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশে কৃষক শ্রমিক শিল্পীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এদেশে তাহা নাই, বাংলার কৃষক শ্রমিক, শিল্পী আজও যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়িয়া আছে। তাই চাষ চলে একই ভাবে, শিল্প গঠে একই ধাঁজে ; তাই এদেশের যা কিছু গর্ব্বের জিনিস সবই আজ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় সহরে বাস করিতে অভ্যস্ত, পল্লীগ্রামের জঙ্গল, ম্যালেরিয়া ও নানাবিধ অসুবিধার জন্য তাঁহারা গ্রামে যাইতে চাহেন না।

নিতান্ত দায়ে পড়িয়া জমিদার মনীশ চৌধুরীকে গ্রামে আসিতে হইয়াছে। জমিদারের সঙ্গে আসিয়াছে অনেক লোক-জন, মোটর প্রভৃতি জমিদার বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিয়াছে।

পথ দিয়া সশব্দে মোটর ছোটে, লোক সভয়ে পথ ছাড়িয়ে দেয়। সেদিন রতনদাদা হঠাৎ গাড়ীর সামনে পড়িয়াছিল এবং

জমিদার পুত্রকে গাড়ী থামাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল। প্রতুল বৃদ্ধের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারে নাই, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বৃদ্ধ রতন দাদাকে কয়েক ঘা প্রহার দিয়াছিল।

কিন্তু বিপত্তি ঘটিল সেইদিন যেদিন সাধুচরণের আড়াই বৎসরের পুত্রটি মোটরের তলায় চাপা পড়িয়া মারা গেল।

সমস্ত কৃষকপল্লীর বুকে গুমরিয়া উঠিতে ছিল চাপা ক্রন্দন, মুখ ফুটিয়া কেহ একটিও কথা বলিতে পারিল না।

রামকান্ত প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমরা সইব না, ধনীর এ অত্যাচার আমরা সইব না। তোমরা ঘর ছেড়ে বাইরে এসো ভাই, এর প্রতিকার করতেই হবে।"

রত্না কাঁদিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল—"তোমার পায়ে পড়ি, তুমি জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে যেয়ো না তোমার স্ত্রী-পুত্র আছে মনে কোর।"

রামকান্ত বলিল, "কাল আমার ছেলেও তো মোটরের তলায় চাপা পড়ে মরতে পারে রত্না, তখন ঘরের কোণে পড়ে গুমরে কান্নার চেয়ে আগেই প্রতিবিধানের চেষ্টা করা ভালো।

কিন্তু প্রজাদের আরজি বিফল হইল, মনীশ চৌধুরী ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন নিজেদের ছেলেমেয়েদের আটক করে রাখতে পারো না, কেন পথে ঘাটে অমন করে ছেড়ে দাও? ছেলেটার নিয়তি তাই সে মোটরের তলায় চাপা পড়ে মরেছে।

ও কিন্তু ঠিক মরতোই—জলে ডুবে, আগুনে পুড়ে, উঁচু জায়গা হতে পড়ে মরলে তো বাপু এ নালিসটী করতে পারতে না, নেহাৎ নাকি মোটরে চাপা পড়েছে তাই এসেছো, নালিশ করতে। মরণ যার এসেছে সে একটা স্থচ বিঁধেও মরে, মোটরে চাপা পড়া একটা নিমিত্ত মাত্র।

রামকান্ত খুসি হইতে পারিল না, শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "আজ যদি আমিও মোটরের তলায় চাপা পড়ি, সেও কি বলব আমার মরণ ওতেই ছিল ?

মনীশ চৌধুরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা নয় তো কি বাপু ? যার যা অদৃষ্টলিপি তাকে তা ভোগ করতেই হবে। এই যে চিরটাকাল তোমরা চাষবাস করে খাও,—জলে ভেজো, রোদে পোড়, ধার কর—রোগে ভোগ, তারপর মর, এসব যেমন তোমাদের অদৃষ্টলিপি এও ঠিক তাই। বাপু হে, তুমি কি চাও সোণার খাটে শোবে, চন্দনকাঠে পুড়বে ? ওটি হওয়ার যো নেই, বিধাতা আগেই তোমার ভাগ্য গড়ে তবে পাঠিয়েছেন।

রামকান্ত নিঃশব্দে আগুন ঢালা দুইটী চোখের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপরে রাখিল।

আর একটিও কথা না বলিয়া কৃষকেরা চলিয়া গেল।

ধনীর অত্যাচার দরিদ্র কৃষক সহ্য করিল না, তাহারা কোর্টে নালিশ করিল।

মনীশ চৌধুরী আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন, মন্ত্র জপ করিতে করিতে বলিলেন, "এসব ছোট লোকদের জব্দ করিতে বেশীক্ষণ লাগবে না। দেখ, এই ওদের ভাগ্যলিপি, ওদের মোকর্দ্দমার হেরে জেলে যেতেই হবে—অমনি করেই না গেয়ো চাষারা মরে। পেটে যদি এতটুকু বিদ্যে থাকতো, অনেক কিছু বিবেচনা করতে পারতো, ভালো মন্দ বুঝতে শিখতো নিরক্ষর চাষা কিনা, কত ভালো হবে—"

রামকান্তই যে এসব কাণ্ডের অগ্রণী।

৩

রত্না সে দিন স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে পায়স ও পিঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সেদিন রামকান্ত দুঃখে বলিয়াছিল, "মা বেঁচে থাকতে আমার জন্ম দিনে কত কীই যে দিত তার ঠিক নেই। মা গিয়ে পর্য্যন্ত এই পাঁচটা বছরের মধ্যে মনেই হয় না কোনদিন আমি জন্মেছিলুম।"

রত্না লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল অপরাধ যেন তাহারই। সে এ সংসারে আসিয়াছে আজ পাঁচ বৎসর, এই পাঁচ বৎসরই রামকান্তের মনে বিস্মৃতি আনিয়াছে কেহই মনে করাইয়া দেয় না—কোনদিন তাহার জন্মদিন আসিল। এই যে বৎসরগুলি আসে এবং কাটিয়া যায়, ইহার মধ্যে এতটুকু বৈচিত্র থাকে না।

রামকান্ত ঠিক পায় না কোনদিন তাহাকে কত বয়সে পদার্পণ করিতে হইল।

জন্মদিনে রামকান্ত চায় এতটুকু বৈশিষ্ট্য আহারের বিভিন্ন খাদ্য সম্ভার,—দরিদ্র চাষীর গৃহে তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া, আনন্দের আয়োজন।

সেদিনে রত্না ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার জন্মদিন, কি খাবার করব বল তো ?"

জন্মদিন—

রামকান্ত নিস্পলকে ক্ষণকালে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "আজ থাক রত্না, ও সব ব্যাপারে দরকার নেই।"

রত্না বলিল, "তুমি কিছু বলবে না জানি। আমি যা করবার তা করছি, কিন্তু তুমি তাতে কোন আপত্তি করো না—এই শুধু বলে যাচ্ছি।" সে চলিয়া গেল।

রামকান্ত ভাবিতেছিল—তাহার ভাবনার শেষ ছিল না। আজ মোকর্দ্দমার শেষ দিন—বিচারে যাহা হইবার হইবে। হয় তাহারা জয়ী হইয়া ফিরিবে নচেৎ হারিয়া জেলে যাইবে। জমীদার উল্টিয়া কতকগুলি অভিযোগ আনিয়াছেন যাহাতে সে বিলক্ষণ জড়াইয়া পড়িয়াছে। রত্না এ সব কথা জানে না, তাহাকে রামকান্ত কিছু বলে নাই।

তাড়াতাড়ি দুইটা আহার করিয়া সে সদরে যাইবার জন্য

প্রস্তুত হইয়া লইল। দুপুরে রত্না পিঠা ও পায়স ধীরে স্বহস্তে তৈয়ারী করিয়া রাখিবে—বৈকালে রামকান্ত সদর হইতে ফিরিয়া খাইবে। যাত্রার সময় রত্না বার বার করিয়া বলিয়া দিল—একটু সকাল সকাল এসো, পথে যেন দেরী করো না।"

দেরী করিবে না তাহা রামকান্ত জানে, কিন্তু যদি সে না ফিরে—।

রামকান্ত রত্নার পানে তাকাইল—উঠানে ক্রীড়ারত খোকার পানে তাকাইল।

কোনদিন ইহাদের সহিত ভালো করিয়া কথা বলে নাই; আত্মবিসর্জ্জি প্রেম দিয়া রত্না কোনদিন তাহার নিকট হইতে একটী ভালো কথা পায় নাই, খোকাকে সে একটা দিন ভালো করিয়া আদর করে নাই। কচিৎ কখনও কাছে আসে, আজকাল সে রামকান্তকে ভয় করিতে শিখিয়াছে—ধমক দিবার আগে তাহার দিকে তাকাইলেই সে ঠোঁট ফুলাইতে আরম্ভ করে।

আজ রামকান্ত খোকাকে কাছে ডাকিল, খোকা আসিল না—

রত্না আশ্চার্য্য হইয়া দেখিল রামকান্ত খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুম্বন করিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, পরিষ্কার করিয়া রত্নার দিকে ফিরিয়া বলিল,

"খোকাকে কোলে করে নাও রত্না,—ওকে যেন কষ্ট দিয়ো না, ও যেন কাঁদেনা দেখো—।"

রত্না যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল,—রামকান্ত আরও কতদিন সদরে গিয়াছে, কিন্তু এ রকম কথা তো কোনদিনই সে শুনিতে পায় নাই। আজ কেন রামকান্ত একথা বলিল, খোকার চার বৎসর বয়সের মধ্যে যাহা করে নাই, আজ কেন তাহা করিল তাহা সে ভাবিয়া পায় না।

রত্না স্তব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ ওরকম করছো কেন, এ রকম কথাই বা বলছো কেন? কোনদিন তো তুমি এরকম কর নি—এ রকম—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর অশ্রুজলে ভিজিয়া উঠিল, তাহার দুইটী চোখ অশ্রুজলে ভরিয়া গেল—সে অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল।

রামকান্ত হাসিয়া উঠিল, বলিল, "নাও, তুমি যে কেঁদেই ভাসিয়ে দিলে—যেন কি ভয়ানক ব্যাপারই ঘটেছে, কিছুই হয় নি রত্না, আমি আবার ফিরে আসব,—মোকর্দ্দমায় আমরা জিতবই।"

রত্না চোখ মুছিয়া বলিল, "কিন্তু আমরা যে গরীব—"

সে যাহা বলিতে চায় তাহা রামকান্ত বুঝিল, বলিল, "গরীব বটে কিন্তু গরীবের জন্যে ভগবান আছেন সেটা মনে করো রত্না। পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম টাকায় কেনা যায়

না,—ওপরে একজন আছেন যিনি সব দেখছেন, সব বিচার করছেন।"

স্ত্রী-পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—তখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে, রত্না শেষ রাত্রে তাহার আহার্য্য তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল।

জন্মদিনের বৈশিষ্টের জন্যই সে কাল রাত্রি হইতে আজ পায়েস পিঠার কলানা রাধিয়া রাখিয়াছিল। উদ্যোগ সে করিতেছিল বটে, মনে আনন্দ ছিল না। কি জানি কেন—মন ভারি বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল।

দুপুরে সে যখন ঘাটে গিয়াছিল—তখন দেখা হইল জীবনের মায়ের সঙ্গে, জীবনও আজ সদরে গিয়াছে—

জীবনের মায়ের মুখে সে শুনিতে পাইল জমীদার মহাশয় অনেক বিদ্রোহী প্রজাকে অর্থ সাহায্যে বশীভূত করিয়াছেন,—তাহারা এখন রামকান্ত, জীবন, আনন্দ প্রভৃতি কয়েক-জনের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছে। জমীদার জানিতে পারিয়াছেন—রামকান্তই প্রজাদের মধ্যে এই অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই জন্য এখন যে কোন রকমে রামকান্তকেই তিনি দমন করিতে চান. এবং সে জন্য তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিতে রাজি আছেন এবং করিতেছেনও।

রত্না কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ফিরিল—

রান্না ঘরে পিঠার আয়োজন পড়িয়া রহিল, জ্বাল দেওয়া দুধ

কড়াতেই রহিয়া গেল—রত্না বারাণ্ডায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল,—অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় সে অধীর হইয়া উঠিয়া ছিল।

পিছন দিক হইতে দুইটী কোমল হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া খোকা বলিল, "মা—পিঠে খাব, পায়েস খাব—"

তিন চার বার বলিতে রত্নার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল; ছেলেকে কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "খাবি বই কি খোকন, আগে উনি বাড়ী আসুন, ওঁর সঙ্গে খাবি।"

খোকা বলিল, "কই, তুমি তো বারছো না মা—

রত্নাকে উঠিতে হইল, আবার পায়েস ও পিঠাতে হাত দিতে হইল, মন তখন কোথায় গিয়াছিল—নিজেই সে তাহা জানে না।

৪

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, রামকান্ত তখনও গৃহে ফিরে নাই।

প্রদীপ জ্বালিয়া রত্না বসিয়া আছে, খোকা বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রত্না তাহাকে খাবার দিতে গিয়াছিল কিন্তু পিতার সহিত খাইবে বলিয়া খোকা খায় নাই।

আগে ও পরে

আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়াছে, পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদখানা এখনই কালো মেঘের তলায় চাপা পড়িয়া যাইবে, শুভ্র আলোয় উজ্জ্বল পৃথিবী এখনই অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যাইবে। যে তারাগুলি এখনও আকাশ পথে মৃদু কিরণ ছড়াইয়া দিতেছে তাহাদের অস্তিত্ব একটু পরে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না!

রত্না ভাবিতেছে রামকান্তের কথা—

সে হয় তো আগে হইতেই জানে আজ তাহার বিচারের ফল কি হইবে, হয় তো সে আর ফিরিবে না জানিয়াই খোকাকে শেষ আদর করিয়া গেছে।—

রত্নার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়—

কেন—কি দরকার ছিল তাহার এত কাণ্ড করিবার, এমন ভাবে ধনী জমীদারের বিষ দৃষ্টিতে পড়িবার? রামকান্ত বলিয়া গিয়াছে দরিদ্রের ভগবান আছেন, কিন্তু রত্না জানে দরিদ্রের কেহ নাই, ভগবানেও তাহাদের উপর বিরূপ। রামকান্ত যাহাদের লইয়া দাঁড়াইয়াছে আজ তাহারাই তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া সাক্ষিও দিতেছে, অর্থলোভ তাহাদের অন্ধ করিয়া দিয়াছে।

"খোকা—প্রসাদ—"

রত্না চমকাইয়া উঠে, কান পাতিয়া শোনে—কিন্তু না, এ রামকান্তের কণ্ঠস্বর নয়,—আর কে ডাকিতেছে। রত্না

উত্তর দিতে পারিল না,—পল্লী-বধুর সঙ্কোচ ও লজ্জা তাহাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিয়া ছিল।—

ছোট্ট উঠানটী রাংচিতার বেড়া দিয়া ঘেরা মাঝখানে ঝাঁপের দরজা, খুলিয়া আসা যাওয়া করা যায়। দরজা ঠেলিয়া উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল সাধুচরণ।— ইহারই পুত্র জমীদার পুত্রের মোটরে চাপা পড়িয়াছে, এবং তাহার পর তাহার সাতবিঘা জমি জমীদার জোর করিয়া দখল করিয়াছেন এই সাধুচরণকে উপলক্ষ করিয়াই জমীদার ও প্রজায় বিবাদ বাধিয়াছিল এবং তাহার ফল এখন সম্পূর্ণ রূপে ভোগ করিতে হইতেছে রত্নাকে।

ঘরের ম্লান প্রদীপের আলো বারাণ্ডার কতকটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল, অতি ম্লান হইলেও সে আলোয় মানুষই দেখা যায়।

সাধুচরণ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল একজন কেহ বারাণ্ডায় বসিয়া আছে,—অনুমানে রত্নাকে বুঝিয়া সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

রত্না সঙ্কুচিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল—ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—“খোকা—”

সাধুচরণ বলিল, “খোকা বুঝি ঘুমিয়েছে বউমা, থাক, ওকে আর ডেকে দরকার নেই, আমি তোমাকেই বলে যাচ্ছি রামকান্তের কথাটা—”

গ্রাম সম্পর্কে ভাসুর হইলেও কোন দিন কথা না বলিলেও রত্নাকে বাধ্য হইয়া আজ লজ্জা ত্যাগ করিতে হইল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনারা সব ফিরে এলেন, কই, তিনি ফিরলেন না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সাধুচরণ বলিল, "না, সে এখন ফিরবে না বউ মা, সে জেলে গেছে—"

"জেলে গেছে—"

রত্নার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে বসিয়া পড়িল, যতক্ষণ তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিল না—

রামকান্ত জেলে গিয়াছে,—সে আগে হইতেই ইহা জানিত বলিয়াই বিদায় লইয়া গিয়াছে। বাহিরে কোথায় কি হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে তাহার বন্ধুগণ সকলেই দাঁড়াইয়াছে, রত্নাকে এ সব কথা সে কোনদিন বলে নাই। সে বোধ হয় ভাবিয়া ছিল রত্না তাহার কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িবে কান্নাকাটি করিবে।

যখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, শুনিল সাধুচরণ বলিতেছে" "সে যাওয়ার সময় বার বার করে বলে গেছে— প্রসাদকে যেন অযত্ন করা না হয়, ওকে যেন মানুষ করা হয়, লেখাপড়া শিখানো হয়।"

লেখাপড়ার উপর রামকান্তের যে কতখানি ঝোঁক তাহা রত্না জানে। সে নিজে নিরক্ষর, মূর্খ, এ ব্যথা তাহার মনে

নিরন্তর জাগিয়াছিল,—নিজের এ ত্রুটি শুধরাইবার চেষ্টা সে করিয়াছিল খোকাকে দিয়া।

রত্নার চোখে জল আসিল না, নিষ্পলকে সে সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সাধুচরণ সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে বর্ণনা করিল।

মণীশ চৌধুরী রামকান্তকে বিশেষ ভাবে জব্দ করিতে চান, তাই তাহাকে অনেকগুলি মামলায় জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। সব চেয়ে বড় একটী—কিছুদিন আগে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে চৈতন্য দাসের বাড়িতে যে ডাকাতি ও খুন হইয়া গেছে সেই অপরাধ রামকান্তের মাথায় চাপানো হইয়াছে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন রামকান্ত দিনে সাধু সাজিয়া থাকিত, রাত্রে ডাকাতি করিত! আশপাশে যে কোন জায়গায় ডাকাতি হইয়াছে সে সবাই তাহার দ্বারা হইয়াছে।

টাকায় সকলেই হয়, তাই যাহারা একদিন রামকান্তের বন্ধু ছিল—যাহাদের জন্য রামকান্ত জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারাই তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রত্না জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন তাঁকে জেলে থাকতে হবে—?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সাধু চরণ বলিল, "বারো বছর—খুন ডাকাতির অভিযোগ?"

বারো বৎসর—

রত্না দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল, মূর্চ্ছিতার মত সে সেখানে পড়িয়া রহিল, সাধু চরণ কখন চলিয়া গেল, আর কি বলিয়া গেল, তাহা সে জানে না।

৬

এই গ্রামের বুকে নিরাশ্রয় অবস্থায় বারো বৎসর কাটানো যে কতখানি দুঃসহ তাহা রত্না জানে।

তাহার বিবাহ হইয়াছে আজ আট বৎসর, এই আট বৎসরের মধ্যে একটা দিন সে স্বামীকে ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। পিত্রালয়ে পিতামাতা না থাকিলেও ভাই বোন, কাকা কাকিমা সবই আছে, তাহারা কতবার লইতে আসিয়াছেন, স্বামীর কষ্ট হইবে বলিয়া রত্না রাজি হয় নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে যে সংসারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, যে কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইয়াছে, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়াছে, এতটুকু ত্রুটি সে করে নাই।

রত্না ভাবে এ পাপের ফল। এ জন্মে সে কি পাপ করিয়াছে জীবনের সে কতখানি সময় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সে পায় না, —কাজেই পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

আজ দীর্ঘ আট বৎসর—ইহার মধ্যে একটা দিন রামকান্ত কোথাও যায় নাই, একটা রাত্রি কোথাও কাটায় নাই। নেহাৎ

কটু কথাটা বলা অভ্যাস বলিয়া মাঝে মাঝে মুখ দিয়া দুই একটা কটুকথা বাহির হইত নিতান্ত রাগি স্বভাব বলিয়াই। এইটুকু না থাকিলে তাহার যে মোটেই মানাইত না এ কথা রত্না সহস্রবার স্বীকার করে। পুরুষ মানুষ—সে রাগ করিবে না, এতটুকু তেজ দেখাইবে না, তবে সে পুরুষ মানুষ হইবে কেমন করিয়া? সাময়িক এতটুকু ব্যথা সময় সময় লাগিলেও সে ব্যথা জুড়াইয়া যায়, সে ব্যাথায় কাঁটা নাই বলিয়া খচ খচ করে না।

আজ রত্নার মনে পড়িতেছে—হয় তো তাহার কাজে কত ত্রুটি ঘটিয়াছিল। কতদিন খোকাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে স্বামীর উপযুক্ত সময়ে আহার্য্য দিতে পারে নাই,—স্বামীর শরীর অসুস্থ হইয়াছে, সে এতটুকু সেবা সময় মত করিতে পারে নাই, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

আজ সেই বেদনায় সে অধীর হইয়া উঠে। রত্না ভাইকে সংবাদ পাঠাইল, সে যদি এ সময় আবার আসে, রত্না তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইবে।

ভাই আসিল এবং সোজা প্রস্তাব করিল—"আমার সঙ্গে চল, এখানে থাকা হবে না।"

এ প্রস্তাবে রত্না সম্মত হইতে পারিলন না।

তাহার স্বামীর ভিটায় প্রদীপ পড়িবে না, বার বৎসর এ ভিটায় এই ঘর কি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে? এই চালা দিয়া

জল পড়িবে, দেয়াল পড়িয়া যাইবে, চারিধারে এই যে সাজানো গাছপালাগুলি, তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে কত আশা করিয়া লাগাইয়াছে, ইহার একটী ও কি থাকিবে ?

রত্না মাথা নাড়িল, শুষ্ক মুখে বলিল, "না দাদা," আমার গেলে তো চলবে না, তিনি যখন ফিরবেন"—

বাধা দিয়া দাদা বলিল, আরে সে কি এখন ফিরবে ? সে তো বড় কম দিন নয়—বারোটা বছর, সে কি বড় মুখের কথা বারো বছর—মানে একটা যুগ,—এই এক যুগের মধ্যে পৃথিবী লণ্ড ভণ্ড হতে পারে, কত কে মরবে, কত কে জন্মাবে তা জানো ? এই বারো বছর জেলের কষ্ট সয়ে কয়টা লোক আবার বাহিরে আসতে পারে বল দেখি ?"

রত্না শিহরীয়া উঠিয়া চক্ষু মুদিল। রারো বৎসর এক যুগ, তা হোক, তবু সে প্রতীক্ষায় থাকিবে, তবু সে এখানে এই কুঁড়ে ঘরেই থাকিবে। সে আশা করিবে তাহার স্বামী আসিবে এবং তাহার সেই একাগ্র কামনাই তাহার স্বামীকে তাহার নিকটে ফিরাইয়া আনিবে ইহা তাহার ধ্রুব বিশ্বাস।

সে আর্দ্র-কণ্ঠে বলিল, "ও অলক্ষণের কথা বলো না দাদা—আমি জানি সে আসবে এখানেই ফিরে আসবে, সে কোথাও যেতে পারবে না, কেউ তাকে নিতে পারবে না। পুরাণের গল্প শুনেছি সতী সাবিত্রী তাঁর মরা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, —আমার যদি তাঁর পরে এতটুকু ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, আমি যদি

তাঁকে কায়মনোবাক্যে সেবা করে থাকি, কারও সাধ্য থাকবে না তাঁকে কোথাও আটক করে রাখতে। বারো বছর পরে তাঁকে এখানে আমার কাছে ফিরতেই হবে, সেই আশা নিয়ে এখানে তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটেয় আমি পড়ে থাকব।"

দাদা রাগ করিল। এমন বোকার মত কাজ ও কেহ করে,— এ ভিটায় আছে কি, যাহা আগলাইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে? ওখানে গেলে ছেলেটা চাষবাসের কাজ শিখিত, ভবিষ্যতে করিয়া খাইবার একটা পথ হইত।

দাদা রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রত্না নিঃশব্দে চোখ মুদিল।

সম্মুখে জাগিয়া রহিয়াছে কর্ত্তব্য, খোকাকে, মানুষ করিতে হইবে, খোকাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। রামকান্ত নিজে লেখাপড়া জানিত না বলিয়া তাহার মনে যে ক্ষোভ ছিল, সে ক্ষোভ সে মিটাইবে। বারো বৎসর পরে রামকান্ত যখন ফিরিবে তখন সে খোকাকে দেখাইবে, জানাইবে খোকাকে সে মূর্খ করিয়া রাখে নাই, খোকাকে সে মানুষ করিয়াছে!

সে দিন কি আসিবে?—

রত্নার চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

৭

জমীজমা সবই খাসে চলিয়া গিয়াছে, মাথা গুঁজিবার ঘর খানি মাত্র থাকিলেও আহারের সংস্থান নাই। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইতে অর্থের আবশ্যক, সে অর্থ পাওয়া যাইবে কোথায়? দাদার কাছে এই প্রস্তাব করিবে বলিয়াই সে তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল কিন্তু দাদা সেদিক দিয়া ঘেঁসিল না।

বর্ষায় ঘর জলে ভাসিয়া যায়, মাথা গুঁজিবার স্থানটুকুও বুঝি নষ্ট হয়। এই বৎসরে ঘর ছাওয়াইবার কথা ছিল, রামকান্ত খড় ঠিক করিয়াছিল, যদি আকস্মিক এই বিপদ না ঘটিত—এতদিন কবে ঘর মেরামত হইয়া যাইত। খড়গুলি জমিদারের পাইক পেয়াদা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, গরু লইয়া গিয়াছে, লাঙ্গল ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে।

গ্রামের কেহ একটা মুখের কথাও সুধাইল না, সকলেই নিজের ব্যাপার সামলাইতে ব্যস্ত। এবার বর্ষাও নামিয়াছে অত্যন্ত বেশী, বৃদ্ধেরাও বলিতেছে এমন বর্ষা তাহারা বহুকাল দেখে নাই।

সাধুচরণ এখানে ছিল না;—জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া এখানে থাকিতে না পারিয়া সে বৎসর দুই তিনের মত সপরিবারে

শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছিল,—কলিকাতার মনীশ চৌধুরী এই সময় মারা গেলেন সংবাদ পাইয়া সে গ্রামে ফিরিল।

ঘর বাড়ী মেরামত করিয়া সে রহিয়া গেল—এবং আবার জমীজমা দেখিতে মন দিল।

শীর্ণাকৃতি প্রসাদের সঙ্গে হঠাৎ একদিন বাজারে দেখা;—তাহাকে দেখিবামাত্র সাধুচরণের মনে অনেকদিন পূর্ব্বের কথা জাগিয়া উঠিল।

আড়াই বৎসর বয়সে যে ছেলেটী একদিন মোটরের তলায় চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে, সে ছেলের শোক আজও তাহার মনে জাগিয়া আছে, সেই ছেলের মুখ, সে এই ছেলেটীর মুখে জাগিয়া উঠিতে দেখিল।

সাধুচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তুই হাতে চোখ মুছিল, তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

খোঁজ লইয়া সাধুচরণ জানিতে পারিল—প্রসাদদের বড় কষ্টে দিন যায়। জমীজমা তাহাদের কিছু নাই, রত্না লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া কোন রকমে ভাতের যোগাড় করে; ছেলেকে স্কুলে দিবার সাধ তাহার মিটিয়া গিয়াছে, আজ কোন রকমে তাহাকে খাইতে দেওয়াই তাহার নিকট কষ্টকর মনে হয়।

মাথা গুঁজিবার ঘরটা পর্য্যন্ত এবাকার বর্ষায় পড়িয়া গেছে,—

রত্না ভাঙ্গা গোয়ালঘরে পুত্রকে লইয়া কোন রকমে দিন কাটায়। সে ঘরও সহস্রছিদ্র, হাজার জায়গা দিয়া জল পড়ে।

সাধুচরণ সন্ধান লইয়া জানিল—ইহাদের দেখিতে কেহ নাই ; গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় নিজেদের লইয়া বিব্রত, পরকে দেখিবার সময় তাহাদের নাই।

সাধুচরণ ক্ষুব্ধ হইল, নিজের উপর রাগ হইল—এ কর্ত্তব্য কি তাহারই নয়—রত্না ও তাহার পুত্র আজকে এই যে কষ্ট পাইতেছে, এ কি তাহার জন্যই নয়? রামকান্ত যে প্রজাদের লক্ষ্য লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রবলশক্তি জমীদারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল, দাঙ্গা করিয়াছিল।এবং তাহার ফল এই যে দীর্ঘকালের জন্য জেলে গিয়াছে, একি তাহার জন্যই নয়? সেই বিদ্রোহ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমানে জমীদারকে বাধ্য হইয়া সংযত হইতে হইয়াছে,—প্রজারাও বাঁচিয়াছে—এও কি রামকান্তের জন্য নয়? সে নিজেকে যজ্ঞে আহুতি দিয়া দধিচীর মত আত্মদান করিয়া একটা দেশকে রক্ষা করিয়াছে—প্রত্যেকেরই সেজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মানুষ কৃতজ্ঞ নয়—কৃতঘ্ন, তাই সে কৃপা ভুলিয়া গেছে, রামকান্তের উপকারের পরিবর্ত্তে তাহার নিরাশ্রয় পরিবারকে কেহ দেখিল না।

সাধুচরণ সঙ্কুচিত ভাবে রত্নার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, কোন ভূমিকা না করিয়া বলিল, "আমায় একটা খবর দিলেই তো হতো বউমা ; এত কষ্ট পাচ্ছো তবু জানাওনি কেন? ছেলেটা একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হয়েছে, দিনরাত যত সব বদ-ছেলের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, না শিখছে লেখাপড়া—না

শিখছে কিছু। রামকান্তের অনেক আশা ছিল সে ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখাবে,—তার তো কিছুই হল না বউমা।"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া রত্নার চোখের জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "কি করব বলুন, উপায় তো কিছু নেই।"

সাধুচরণ বলিল, "উপায় আছে বউমা; এ ঘর তো ভেঙ্গে পড়েছে, তুমি প্রসাদকে নিয়ে আমার বাড়ীতে চল।"

রত্না উত্তর দিল না।

স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে চায় না। কিন্তু জিদ তাহার রহিল না, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে রাজি হইতে হইল।

সাধুচরণ তাহাদের একখানা ঘর ছাড়িয়া দিল, প্রসাদকেও স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল, তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার সে গ্রহণ করিল।—

৮

দিনের পর দিন যায়—

রত্না দিন গণে।—

বার বৎসর শেষ হইতে আর কতদিন আছে? বহুদিন—বহুদিন—উঃ।

অতদিন কি রত্না বাঁচিয়া থাকিবে?

প্রসাদকে মানুষ করিতে হইবে, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। এই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল।

পাড়ার সকলে হাসে—

বলে, "চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে কি জজ হবে, না মাজিষ্টর হবে গো রামকান্তের বউ? ও সব মতলব ছাড়ো, চাষার ছেলেকে চাষার ছেলের মত তৈরী কর। এরপর একটা ছুটো পাশ দিয়ে ও কি মাঠে লাঙ্গল চষতে যাবে না ধান নিয়ে ঝাড়তে বসবে?"

রত্না উত্তর দেয়—"কিন্তু তিনি বলে গিয়েছেন ওকে লেখাপড়া শিখাতে—"

পাড়ার লোকেরা গালে হাত দিয়ে বলে—"তিনি বলে গেছেন বলে লেখা পড়া শিখাতে হবে—? লেখাপড়া শিখে ছেলে আর কোনদিন মাঠের কাজ করতে পারবে?"

রত্না নিঃশ্বাস ফেলে।

প্রসাদ ততক্ষণ অঙ্ক কষে।

স্কুলের শিক্ষকেরা চাষার ছেলের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারেন না। প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক ক্লাসে সে প্রথমস্থান অধিকার করিবেই, প্রত্যেক প্রশ্নের সে এমন নিভু‌ৰ্ল উত্তর দেয় যাহা শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া যায়।

স্কুল ইনেস্পক্টার স্কুল দেখিতে যতবার আসিয়াছেন এই চাষার ছেলের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া

গিয়াছেন। রত্নার কানে এ সংবাদ পৌছায়, সে দুই হাতে আর্ত্ত-বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধপানে তাকাইয়া থাকে, চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিয়া পড়ে।

কবে—কবে—তাহার স্বামী আসিবে ?—

দাদার কথা মনে হয়,—

রত্না শিহরিয়া উঠে।

একদিন নয় দুদিন নয়, দীর্ঘ বারো বৎসর, বারো বৎসর পরে সে ফিরিয়া আসিবে তো ? রত্না যে প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছে, তাহার সে প্রতীক্ষা সার্থক হইবে তো ?

রত্নার সারাঅন্তর নিঃসাড় হইয়া যায়। তখনই সে জোর করিয়া সাহস ফিরাইয়া আনে।

তাহার স্বামীকে তাহার কাছে ফিরিতে হইবেই, সে যদি স্বামীকে সত্যই ভালবাসিয়া থাকে তাহার সেই একানিষ্ঠ প্রেমই স্বামীকে ফিরাইয়া আনিবে। তাহার যে সতীধর্ম্ম তাহাকে ধর্ম্মের মত ঘেরিয়া রাখিয়া রক্ষা করিতেছে, তাহাতেই যত অমঙ্গল প্রতিহত হইবে, মৃত্যুও তাহার নিকট ব্যর্থ হইবে।

পুরাণের সাবিত্রীর গল্প সে কথক ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছে। সাবিত্রীর পতিব্রত্য সত্যবানকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহার তুলনায় রত্না অতি ক্ষুদ্র, তবুও তাহার একানিষ্ঠ সতীধর্ম্মই কি স্বামীকে বারো বৎসর পরে তাহার কাছে ফিরাইয়া দিবে না ?

রত্না কল্পনায় দেখিতে পায় রামকান্ত ফিরিয়াছে—সে রোগা হইয়া গিয়াছে, বারো বৎসর জেলের কষ্টে রোগা হইবারই কথা। বারো বৎসর পরে রামকান্ত ফিরিয়া দেখিতেছে রত্না প্রসাদকে মানুষ করিয়াছে। রামকান্তের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে।

রত্না ভাবে—রামকান্তের মনের ভাব সে দিন কি রকম হইবে, সে কতখানি আনন্দ পাইবে।

রত্নার চোখের জল যখন শুকাইয়া যায়, সে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া থাকে—চোখের সামনে ভাসে রামকান্তের মূর্ত্তিখানি।

প্রসাদ অনেক ডাকের পর মায়ের চেতনা ফিরাইয়া আনে, চমকাইয়া উঠিয়া রত্না বলে—"কি খোকা আমায় ডাকছিস ?"

প্রসাদ বলে, "আমাকে আর খোকা বলে ডেকোনা মা আমার বড় লজ্জা হয়—স্কুলের ছেলেরা সব খোকা বলে ডাকতে আরম্ভ করে।"

রত্না নিজের ভুল সংশোধন করে।

প্রসাদ বলে, "তুমি বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছ মা, একবার কবিরাজ কানাইকে বলে একটু ওষুধ এনে দেব ?

রত্না হাসে।

সাধুচরণ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে,—তাহাকেও প্রসাদকে খাইতে পরিতে দিতেছে, প্রসাদকে স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের হাতে পায়ে

ধরিয়া ফ্রীতে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে, রত্না যদিও তাহার সংসারের সব কাজ করে—তথাপি সাধুচরণের ঋণ এতটুকু পরিশোধ করিতেছে বলিয়া কোন দিনও তাহার মনে হয় নাই। ইহার উপর চিকিৎসা— ?

বোঝার ভারে রত্না নিজেই মাথা তুলিতে পারে না, পরের উপর এত বোঝা সহ ভর দিয়া সে নিজেই বড় সঙ্কুচিত—ইহার উপর আরও ভর দেওয়া চলে কি ?

রত্নার হাসি দেখিয়া প্রসাদ কুণ্ঠিত ভাবে সরিয়া যায়, বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবার শক্তি ও তাহার যথেষ্ট হইয়াছে।

প্রসাদ যেদিন গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সকলের প্রথমস্থান অধিকার করিল, সে দিন গ্রামের কাহারও মুখে তাহার কথা ফুরায় না।

চাষার ছেলে বরাবরই মাঠে চাষবাসই করে, প্রসাদ একাই এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইল। মধুমণ্ডল তামাক টানিতে টানিতে বলিল,—"তারপর এখন সে করবে কি— ?"

কতকটা উদাসভাবে নবীন উত্তর দিল, "দারোগা গিরি কাজ টাজ করবে।"

যেন চমকাইয়া উঠিয়া মধু বলিল, "দারোগাগিরি কাজ পাবে আমাদের রামকান্তের ছেলে ওই পেসাদি— ? কক্ষনো নাঃ তুমি দেখে নিয়ো নবীন আমার কথা মনে রেখো ; ও বড়জোর দারোয়ান কি পিয়নের কাজই করবে, তা ছাড়া—"

বলিতে বলিতে একটা নিঃশ্বাস সজোরে ফেলিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ,—আমাদের রামকান্তের ছেলে প্রসাদ, সে হবে নাকি জেলের দারোগা। ওরে, দারোগা হওয়া কি বড় মুখের কথা, একটু বইয়ের পাতা উল্টাইতে জানলেই যদি পুলিশের দারোগা হওয়া যেতো—তা হলে পথে ঘাটে আমরা অমন লাখো দারোগা দেখতে পেতুম। কত চাম খড় পুড়াতে হয়, কত টাকা খরচ করে কত বিদ্যে শিক্ষতে হয়, তবে হওয়া যায় দারোগা—তা কিছু জানিস মুখ্যু ?"

নবীন সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, "কিন্তু পেসাদি যা ইংরেজী শিখিয়াছে খুড়ো, সে যেন সাহেবদের মত গত মত করে ইংরেজী বলে,—একেবরে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়! এই যে সে দিন আমাদের এখানে হাকিম সাহেব এসেছিল না, তানার সঙ্গে কথা বলতে আর কেউ পারেনি, শেষে পেসাদি গেল এগিয়ে। সে যে কি কথাই বললে খুড়ো, সাহেব একেবারে জমে গেল, বললে না পেত্যয় যাবে—সাহেব আর নড়তে চায় না।"

মধু মুখ বক্র করিয়া বলিল, "তাতেই ধরে নিলি পেসাদি দারোগা হবে? হ্যাঁ, দারোগা বড় মুখের কথা কিনা, দারোগার বোল বোলাও, তম্বি গাম্ব কত চোখেও দেখিস নি—কানেও শুনিস নি ?"

আলোচনা শুধু এখানেই নয়—মেয়ে মহলেও বড় কম হয় নাই। কেহ কেহ সাধুচরণের বাড়ীতে গিয়া পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আসিল।

সাধুচরণকে অনেকে অনেক কথাই বলিল, সাধুচরণ কোন কথাই কানে তুলিল না, যেমন তামাক টানিতে থাকে তেমনই টানিতে লাগিল।

যে কয়ঘর ভদ্র লোক গ্রামে বাস করিতেন, চাষার ছেলে মাট্রিকে প্রথম হইয়াছে—"এ গ্লানি তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতে ছিলেন না। কেহ সাধুচরণকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিলেন, কি হে সাধু, পুষ্যিপুত্তর নিচ্ছ কবে— ?"

কেহ বলিলেন "সাধুচরণ দুধের সাধ ঘোলে মিটাচ্ছে। নিজেরএকটী মাত্র ছেলেকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরের ছেলে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছে। সাধুচরণ ভাবছে না—নিম গাছের ছাল আম গাছে জোড়া লাগে না।

সাধুচরণ শুষ্কহাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে সে কথা খুবই জানি। পুষ্যিপুত্তুর নেব না, কিছুই করব না, ওর বাপ আমাদের জন্যেই আজ ও জেলে পচছে, তারই জন্যে দেখা শোনা, ছেলেটাকে লেখা-পড়া শিখানো। অবিশ্যি এটা যে শুধু আমারই উচিত তা নয়; আপনাদের সকলেরও বটে। রামকান্ত কেবল আমার একার জন্যেই জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি, আমার একটি মাত্র ছেলে সে তো মারা গিয়াছেই—আর ছেলে মেয়ে নেই যার জন্যে আমায় সাবধান হতে হবে। আপনাদের জন্যেই সে চেষ্টা করেছিল, মারা-মারি করেছিল, শেষটায় জেলেও গেছে। এখন তার পরিবারকে দেখাশুনা করা আপনাদের ও কর্ত্তব্য ছিল বই কি ?

ভদ্রলোকেরা আর কথা বলিতে পারেন নাই। বাড়ী ফিরিয়া সাধুচরণ রন্ধনরতা রত্নাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল," গাঁয়ের লোকের কথা শুনে যেন কিছু মনে করোনা মা—ওরা সব কিছু বলতে ও পারে, করতেও পারে। তুমি সম্পর্কে আমার বউমা হলে ও আমি তোমায় আমার মেয়ের মত মনে করি, তেমাদের যাতে ভালো হয়, আমি তাই করব। পেসাদি খুব ভালো হয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে বলে ওরা সব এত কথা বলেছে, এত কাণ্ড ও করছে। ওরা যত যা খুসি বলুক বউমা, ওদের কথায় কান দিয়ো না।"

রত্না রন্ধন করিতে করিতে গোপনে চোখের জল মুছিল।

সে হিসাব করিয়া দেখে—আর কত বৎসর বাকি আছে—রামকান্ত আর কতদিন পরে ফিরিবে।

বারো বৎসরের দশ বৎসর গিয়াছে আর দুই বৎসর বাকি কোন রকমে এই দুই বৎসর যদি কাটাইয়া দেওয়া যায়। দিন দিন রত্নার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, হয়তো কোন দিন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে।

রত্না দৃঢ়-ভাবে মনকে বুঝায়—না, এখন নয়, তাহার মৃত্যুর সময় এখনও আসে নাই আসিবে ও না। তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিবে, পুত্রকে সে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিবে, স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় দিবে। রামকান্তকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে, তাহার পদসেবা করিবে—তাহার পর মৃত্যু আসুক সে ভয় পাইবে না।

চোখ মুদিয়া মনে মনে সে ডাকে—আশা পূর্ণ কোর মা সতীরানি, আমায় ব্যর্থ করো না—।

৯

বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—রামকান্ত ফিরে নাই।

সাধু চরণ খোঁজ লইতে গিয়াছিল. সে ফিরিয়া আসিয়াছে, রামকান্তের খোজ পাওয়া যায় নাই। সাধুচরণ শুনিয়াছে—রামকান্তের জেলের মধ্যে অসুখ হইয়াছিল সে জন্য তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠানো হইয়াছিল, সেখান হইতে সে আর জেলে ফিরে নাই!

অগণ্যের মধ্যে নগণ্য রামকান্ত,—কে তাহার সন্ধান রাখে? কোটি কোটি বুদ্বুদের মত সে একটী, কোথায় শুকাইয়া গেল সে সংবাদ কেহ রাখে না। যদি সে ধনী হইত, হয়তো তাহার সন্ধান মিলিলে ও মিলিতে পারিত, কিন্তু সে দরিদ্র, তাহার নাম ও কেহ জানে না।

সাধু চরণ ভাবিয়াছিল এ সব কথা সে বাড়ীতে বলিবে না, কিন্তু শুষ্ক মুখী রত্না যখন সামনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সে সেকথা গোপন রাখিতে পারিল না।

রত্না কাঁদিল না, একটা নিঃশ্বাস পড়িল কিনা তাও কেহ জানিল না; উদাস নেত্রে একবার আকাশের পানে তাকাইয়া সে ঘরে ফিরিল।

প্রসাদ মায়ের কোলে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতেছিল, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে রত্না শান্ত-কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছিস কেন প্রসাদ, আমি বলেছি তিনি মরেন নি, তিনি মরতে পারেন না। ওরা যে যাই বলুক, আমি কিছুতেই বিশ্বসে করব না, তিনি নেই। আমি বলছি তিনি ফিরে আসবেন, আবার আমাদের কাছে আসবেন! তুই দেখিস প্রসাদ, আমার কথা মিছে হবে না।"

পাড়ার লোক রত্নার সধবার সাজ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, পাঁচজনে পাঁচকথা বলিল, কিন্তু রত্না সে সব কথায় কান দিল না।

তাহার মন বলিতেছে সে বিধবা নয়, বিধবা হইতে পারে না। মনে পড়ে ছোটবেলায় একজন জ্যোতিষী তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল এ মেয়ে বিধবা হইতে পারে না, সধবা অবস্থায় স্বামির কোলে মাথা রাখিয়া সে মরিবে, সে কথা মিথ্যা হইবে ?

অর্থাভাবে প্রসাদ আর পড়িতে পারে নাই, সে চাকরীর চেষ্টা দেখিতেছিল।

মাকে ছাড়িয়া দূরে যাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, সাধুচরণ ও নিষেধ করিল। ম্যাট্রিকপাস বিদ্যা লইয়া প্রসাদ হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজে লাগিতে পারিল না, পার্শ্ববর্তী গ্রাম আনন্দপুরের মাইনরস্কুলে কুড়িটাকা বেতনে কাজ পাইয়া তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িল।

আগে ও পরে

গরীবের নিকট কুড়ি টাকার মূল্য অনেকখানি। প্রথম যে দিন বেতন আনিয়া প্রসাদ মায়ের হাতে দিল, সে দিন রত্নার যত পড়িল চোখের জল, তত ফুটিল হাসি, সাধু চরণেরও সে দিন আনন্দের শেষ রহিল না।

এবার চলিল প্রসাদের বিবাহের প্রস্তাব—একটী বিবাহ যোগ্যা কন্যা লইয়া সাধুচরণের বাড়ী আসিয়া উপাস্থত হইল।

সাধুচরণের পত্নী ভগিনীকে নিজ গৃহে স্থান দিল,—সাধুচরণকে জানাইল—প্রসাদের সহিত বিবাহ দিবার জন্য সে মেয়েটীকে আনাইয়াছে। কিন্তু রত্না মত দিল না, বলিল, "তিনি আগে আসুন, তারপরে প্রসাদের বিয়ে দেওয়া হবে।"

সাধুচরণের স্ত্রী মনে মনে আহত হইল, একটু রাগও হইল, বলিল, "ঠাকুরপো কবে আসবে বলে তুমি ছেলের বিয়ে দেবে না ? বিয়েটা দাও, ছেলেটাকে সংসারী কর !"

রত্না চুপ করিয়া রহিল।

অবশেষে মত দিতে হইল—বিবাহ ও হইয়া গেল।

অবশ্য রত্নার দুঃখ করিবার কারণ ছিল না কারণ মেয়েটী শান্ত ও সুন্দরী। সাধু চরণের স্ত্রী রত্নাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি দেখো প্রসাদের মা, আমার বোনঝিকে নিয়ে ঘর করে দেখো—সে সত্যি বড় ভালো মেয়ে, কোনদিন তাকে নিয়ে তোমার কষ্ট পেতে হবে না, এ আমি বলে রাখছি।"

রত্না কেবল হাসে।

১০

স্থখের সংসার

অনেক দিনই কাটিয়া গেছে।

প্রসাদের প্রিয় ছাত্র রমেশের দুনিয়ায় তাহার কেহ নাই, প্রসাদের সাহায্যে সে মানুষ হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে। সে ব্যবসায় লাগিয়া প্রথমেই বহু অর্থ লাভ করিয়াছে,—সেই অর্থে সে গ্রামের ছেলেদের জন্য একটা স্কুল তৈয়ারী করিয়াছে। এই স্কুল সে এখন গুরুপ্রাসাদের নামে স্থাপন করিতে চায়—

প্রসাদ হাসিয়া বলে—"পাগল"

কিন্তু রমেশ কথা শুনে না—

সে বলে, "আমি তো কিছুই করতে পারিনি দাদা নিজে লেখাপড়া শিখতে বড় কষ্ট পেয়েছি বলে যাতে গরীব ছেলেরা এখান হতে বিনা মাইনেতে পড়তে পায় তার জন্যে এই স্কুলটা করলুম। তোমার দয়া না পেলে এতদিন কোথায় ভেসে যেতুম কে জানে। তোমার নামে এই স্কুলটা আমি করবই এই আমার একমাত্র ইচ্ছে—এতে তুমি আপত্তি করো না।"

প্রসাদ বলে, "তোমার অভিপ্রায় খুব ভালো গরীব ছেলেদের লেখাপড়া শিখবার ইচ্ছা থাকলেও তারা পয়সার জন্যে, স্থযোগের

অভাবে শিখতে পায় না। এদের জন্যে তুমি যে স্কুল করে দেবে এতে তোমার মহা-পূণ্য হবে। কিন্তু আমার নামে স্কুলটা উৎসর্গ করো না,—এতে আমার নিজেরই বড় সঙ্কোচ হয়।"

কিন্তু রমেশ ছাড়ে না।

অবশেষে স্থির হইল রামকান্তের নামে এই স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হইল ও তাহাই।

স্কুল প্রতিষ্ঠার দিন নিমন্ত্রিত হইয়াছে সকলেই, গ্রামের ছোট বড় উচ্চ নীচ কেহই বাদ যায় নাই। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে আসিবেন—তাঁহার উৎসাহ ইহাতে বড় কম নয়। বাংলার পল্লী সমাজের দুরবস্থা তিনি দেখিয়াছেন, ইহার মূল কারণ যে নিরাক্ষরতা তাহা তিনি বুঝেন এবং সেই জন্য জেলার শিক্ষা বিস্তারে তিনি অগ্রণী হইয়াছেন।

দেশের বর্ত্তমান জমিদার প্রতুল চৌধুরী। রমেশ তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছে। চাষী প্রজাদের এই ধৃষ্টতা, জমিদার প্রতুলকে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছে, কিন্তু কোন উপায়ও সে খুঁজিয়া পায় নাই। গ্রামে একটা স্কুল থাকিতে আরও একটা স্কুল বিশেষ করিয়া ছোটলোকদের জন্য যাহাতে না হয়, সে জন্য সে অনেক বাধা দিয়াছিল কিন্তু তাহার বাধা এই সব চাষাদের একাগ্র সাধনার নিকটে ব্যর্থ হইয়া গেছে সকলের বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া গ্রামের মধ্যে স্কুল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রতিষ্ঠার দিনও আসিয়াছে।

রমেশ নিজে কলিকাতায় প্রতুল চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল, প্রতুল স্পষ্ট কথায় বলিয়াছে এ কেবল গ্রামে যে হাই স্কুলটী তাহার পিতা স্থাপন করিয়াছেন, সেইটী কে নষ্ট করিবার ইচ্ছা। ইহার জন্য সে রমেশকে বেশ দু কথা শুনাইয়া দিয়াছে।

ব্যথা যে কোথায় তাহা বুঝিতে রমেশ বা প্রসাদের বিলম্ব হয় নাই। দাম্ভিক জমিদার সেকালের মত আজও প্রজাশাসন করিতে চাহিলেও তাহারা শাসন মানে না, উল্টিয়া নালিশ করে, জমীদারকে কথায় কথায় বিপদে ফেলে।

প্রতুলের কথার উত্তরে রমেশ জানাইয়া আসিয়াছে নেহাৎ জমীদার বলিয়াই সে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল, তিনি না গেলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন আসিতেছেন, আর কেহ না গেলেও চলিবে।

প্রতুল প্রজার স্পর্দ্ধায় ক্রোধে লাল হইয়া গিয়াছিল। যাহাতে স্কুলটা না হয় তাহার জন্য সে উপরে আবেদন ও জানাইয়াছিল একই গ্রামে পাশাপাশি দুইটী স্কুল হইতে পারে না—ইহাতে ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা ভালো হইবে না।

উপর হইতে কোন সাড়া আসিল না।

প্রতুল নিজে স্কুল ইনেস্পেক্টারের সহিত দেখা করিল, তিনি কৈফিয়ৎ চাহিলেন, কেন একই গ্রামে দুইটি স্কুল হইতে পারিবে না তাহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তিনি মনে করেন বর্ত্তমানে শিক্ষার প্রসারের জন্য পাড়ায় পাড়ায় পর্য্যন্ত স্কুল হওয়া দরকার।

প্রতুল আমতা আমতা করিয়া বলিতেছিল—"কিন্তু চাষাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে শুধু ভণ্ডামী, তারা তো চাকরী করবে না—"

ইনেস্পক্টার গম্ভীর মুখে বলিলেন, "যদি করে—উপযুক্ত হলে নিশ্চয়ই চাকরী পাবে। আর যদি চাকরী না করে, লেখাপড়া শিখে তারা চাষের উন্নতি করতে পারবে, স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারবে।"

প্রতুল ব্যর্থ হইয়া ফিরিল।

নূতন স্কুলের সামনে বিস্তৃত মাঠে বিরাট সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

কৃষকেরা নিজেরাই বিনা মজুরীতে এই সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছে, ছেলেরা রমেশের সাহায্যে মণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়াছে। কেবল গ্রামের নয়, বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরাও আসিয়াছে,—সকলেই জানে রামকান্তের নামে এই স্কুল স্থাপন হইবে।

স্কুলের বারাণ্ডা ঘেরিয়া দিয়া সেখানে মেয়েদের বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, রত্না এবং আরও অনেক মেয়ে সেখানে আসিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সকলেই

সাহেবের বক্তৃতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল—সাহেব প্রসাদকে অশেষ প্রশংসা করিলেন, রমেশকে অনেক উপরে স্থান দিলেন।

এই সময়ে বাহিরের দিকে খুব গোলমাল হইতেছিল, প্রসাদ গোলমাল থামাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল—

ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল একজন লোক—

মাথার চুল তাহার সাদা হইয়া গেছে,—দেহ শীর্ণ—

বৃদ্ধেরা মহানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"রামকান্ত রামকান্ত—"

চিকের আড়ালে রত্না মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—।

প্রসাদ দুই পা অগ্রসর হইয়াছিল, থামিয়া বিস্মিত নেত্রে আগন্তকের পানে তাকাইয়া রহিল। সভার সমস্ত লোক নিস্তব্ধ—একটী শব্দ পর্য্যন্ত ছিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেটও বিস্মিত নেত্রে আগন্তকের পানে চাহিলেন।

আগন্তক করযোড়ে বলিল—"হুজুর আমার নাম রামকান্ত, আমিই জেলে গিয়েছিলুম, আমার নামেই এই স্কুল এরা করছে। এ কাজ করবেন না হুজুর, আমি নিরেট মুখ্যু, লেখাপড়ার নাম মাত্র জানিনে,—আমায় এমন বিপদে ফেলবেন না।"

সাহেব হাসিলেন, বলিলেন; "স্কুল প্রতিষ্ঠা তোমার নামেই হল রামকান্ত—আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমি চললুম।

রামকান্ত প্রসাদকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল—।

রত্নার আনন্দ ধরে না—

তাহার মত সৌভাগ্যবতী কে?

রামকান্ত সব কথা বলে।

ব্যারাম হইয়া সে হাঁসপাতালে যায়, সেখান হইতে ভালো হইয়া সে এক ডাক্তারের সঙ্গে রেঙ্গুণে চলিয়া যায়। সেখানে সে ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে।

রত্নার কথা সত্য হইয়াছে—

তাহার স্বামী ফিরিয়াছে—পুত্রকে দেখিয়াছে। গ্রামের মেয়েরা তাহাকে সিঁদূর লোহা পরাইয়া দিল, থান ছাড়িয়া লালপাড় শাড়ি পরিয়া সে রামকান্তের পায়ের ধূলা মাথায় দিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর—যেন তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে পারি।"

রামকান্ত তাহার মাথায় হাত রাখিল।

মিলনে

—নারাণ ছিল দলের কর্ত্তা।

দলটী নেহাৎ ছোট ছিল না, তিন চারখানা গ্রামের ছেলে মিলে এই দলটী তৈয়ার করেছিল। এদের মধ্যে নারাণের মত সাহস, অলৌকিক বুদ্ধি আর কারও ছিল না; এমন কাজ ছিল না যা সে পারিত না। যে কাজ করতে সবাই পেছিয়ে যেত, নারাণ হাসতে হাসতে সে কাজ করে ফেলত! এই রকম কতকগুলি গুণে নারাণ অতি সহজে সব ছেলেদের পরে সে প্রভুত্ব খাটাত।

গ্রামের লোকেরা এই ছেলেদের দ্বারা জ্বালাতন হত বড় কম নয়। গাছের ফল এদের জ্বালায় রাখা শক্ত ব্যাপার। এরা শুধু ছিদ্র খুঁজে বেড়াত, কারও এতটুকু ছিদ্র পেলে তার সর্ব্বনাশ করে ছাড়ত।

নারাণ বাঁশী বাজাতে পারত ভারি সুন্দর। আর সব গুণগুলি দশজনের কাছে দোষ নামেও উল্লেখ হলেও বাঁশী বাজনকে সকলেই প্রশংসা করত।

সংসারে তার ছিল বড় ভাই। বড় ভাই মাঠের কাজ করত, জন খাটাত, সকাল হতে তার পরিশ্রমের শেষ ছিল না। ছোট ভাইটিকে লেখাপড়া শেখাবার দিকে তার খুব লক্ষ্য ছিল।

আগে ও পরে

সুদাম নিজে কিছু করতে পারে নি। বাপ যখন মারা যান তখন সে ছিল পনের বছরের ছেলে মাত্র। কাকা তার বাপের বিষয় সম্পত্তি দেখবার নাম করে একে একে নিজেই সব আত্মসাৎ করতে লগেলেন—বিনিময়ে দুইটী ভাইকে দুই বেলা খেতে দিতেন, বছরে কয়খানা কাপড় দিতেন। নারাণ তখন শিশু, মাত্র তিন বছর বয়স তার। সেই ভাইটীকে রাখত সুদাম, আর কাকার সংসারে ভূতের মত খাটত।

একটু বয়স হলে সে যখন সব বুঝতে পারলে তখন কাকার কাছে তার বিষয় ফিরে চাইলে। কাকা দিলেন—কিন্তু অর্দ্ধেক প্রায় নিজে আত্মসাৎ করে—

সুদাম বিয়ে করলে, 'তারা' এসে সংসারের কর্ত্তৃর আসন নিয়ে বসল। তখন নারাণ ছোট,—সুদামের স্নেহে লালিত-পালিত।

তারা এই দেওরটীকে প্রথম হতে সুচোখে দেখতে পারত না, কিন্তু সুদামের অত্যধিক স্নেহ দেখে কিছুই বলতে পারত না।

গ্রাম হতে ক্রোশ খানেক দূরে স্কুল,—গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে স্কুলে যেত আবার আসত। সুদাম নারাণকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলে, মাসে মাসে মাইনের টাকা, পড়বার বইয়ের টাকা, টিফিনের পয়সা নিয়মিত ভাবে দিতে লাগল। তারা স্বামীকে কিছু বলতে পারত না, পাড়ার রামের পিসী, সন্তোষের মা, নীলাম্বরের দিদি, এদের সঙ্গে সদুঃখে বলত, এই যে মাসে

মাসে দশ বার টাকা করে অনর্থক ঢালছেন, এতে কি কিছু ফল পাবেন! ও ছেলেও লেখাপড়া শিখবে, ওঁকেও চাকরি করে টাকা এনে দেবে। লেখাপড়া যে শিখবে এ আশা আমি এতটুকু করিনে, যদিও করে—যদিও কাজ পায়, একটী পয়সা যদি দেয় তো আমি বামুনের মেয়ে নই।"

স্থদামের কাণে কদাচিৎ দুই একটা কথা এসে পৌছাত, স্ত্রীর মুখে নয়, বাইরের লোকের মুখে। সে সব কথা সে হেসে উড়িয়ে দিত। যেমন করেই হোক; নারাণটা যদি মানুষ হয় এই তার প্রধান লক্ষ্য। সে নিজে কিছুই করতে পারে নি, এই ক্ষোভটা তার মনে বড় বেশী রকম জাগত। ছোট ভাইটীকে দিয়ে সে তার সকল ক্ষোভ মিটাইতে চাইত।

সে নিজে ভাল কাপড়, জামা, জুতা ব্যবহার করতে চাইত না। তারা বলত,—"তা বাপু একখানা ভাল কাপড়ই না হয় পরলে, এক জোড়া ভাল জুতা না হয় পায়ে দিলে।"

স্থদাম একটু হেসে উত্তর দিতে, "ভাল কাপড়, ভাল জুতো পরে কি মাঠের কাজ করা চলে বউ, মাঠের কাজ করতে গেলে চাই এমন কাপড় যা হাঁটুর' পরে উঠবে, চাই খালি পা। বিকেলে গাঁয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় যদি ভাল জুতো কাপড় পরি, লোকে হাসবে যে।"—

ভাইয়ের জন্য ভাল জুতা, কাপড়, জামা আসত, নারাণ যখন সে সব পরে দিব্য বাবুটি হয়ে বেরুত তখন তারার পা হতে মাথা

পর্য্যন্ত জ্বলত, আগুণ মাথা দৃষ্টি নারাণের 'পরে ফেলে সে সরে যেত।

নারাণের তাতে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। যখন যে জিনিষের অভাব হতো দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে দাদার কাছে চাইত, দাদাও যেমন করে পারত এনে জুটাত।

গত বছর পূজায় সময়ে তারা স্বামীর কাছে একজোড়া কাণের ফুল চেয়েছিল, স্বামী মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল,—"তাই তো বড় বউ, এখন যে হাতে একটা পয়সা নেই, পনের কুড়ি টাকা পাই কোথায় যে তোমার ফুল তৈরী করে দিই।"

সেই স্থদামই ষষ্ঠীর দিন সহরে গিয়ে যখন ভাইয়ের জন্য কাপড়, জামা ও জুতোতে প্রায় পনের কুড়ি টাকা খরচ করে ফিরল, তখন তারা বাস্তবিকই আগুনের মত জ্বলে উঠেছিল।

স্থদাম একটু হেসে তাকে বুঝিয়েছিল, "রাগ করোনা বড় বউ—ধর, আজ যদি তোমার একটি ছেলে থাকত, তাকে কিছু না দিয়ে তুমি কি নিজে গহনা পরতে চাইতে, নারাণকে পাঁচ জায়গায় যেতে হয়, স্কুলে যেত হয়, ওরই কাপড় জামার আগে দরকার।"

তাহার মনের আগুণ নিবলনা; দিন দিন আরও মনের মনের অশান্তি বাড়তে লাগল।

আগে ও পরে

প্রথম প্রথম নারাণ বুঝতে পারত না, বউদি তাকে বিদ্বেষের চোখে দেখে, তাই সে অসঙ্কোচে বউদির কাছে ও আবদার করত, বউদি কিছু না দিলে যেমন করেই পারত তাকে জব্দ করে অসীম আনন্দ অনুভব করত। বউদি রাগ করে যে গালা-গালি করে তা যে, যথার্থই তার অন্তর হতে উদ্ভুত তা সে কোন দিনই ভাবে নি। বউদিকে সে ছোটবেলা হতে দেখে আসছে, সে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনদিনই তাকে ভাত দেয় নি, তা সে স্বপ্নেও জানত না।

কোনদিনই সংসারের ভিতরকার খবর সে জানে নি, জানতেও চায় নি। সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠেই সে সুবলদের বাড়ী পড়তে চলে যেত, সাড়ে নয়টায় বাড়ী এসে ভাত তার চাই-ই। ভাত খেয়ে সে স্কুলে যেত, বিকালে বাড়ীতে ফিরে, বই ফেলে যা হয় কিছু জল খেয়ে খেলতে যেত, সন্ধ্যায় বাড়ীতে এসে খানিকটা পড়ে দাদার সঙ্গে ভাত খেয়ে দাদারই পাশটীতে গিয়ে শুয়ে পড়ত। কি সুখের দিনগুলিই না তখন কাটত।

তাহার কথা ভগবান কাণে নেন নি, নারাণ দুষ্ট ছেলে হলেও বৎসরের পর বৎসর খুব ভাল হয়েই ক্লাসে উঠতে লাগল।

বড় হওয়ার সঙ্গে সে যেন বউদিকে একটু একটু চিনতেও পারছিল। আজকাল তারা সুদামের সামনা সামনি নারাণের বিপক্ষে কথা বলে। কোনদিন সে কোথায় কি করে আসত সে

সব খবর যত্ন করে নিত, তারপর স্বামী বাড়ী এলে বেশ করে বাড়িয়ে শুনাত। সুদাম নীরবে শুনে যেত, তার কপালে একটা রেখাও পড়ত না, যেন তারার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়. এমনি ভাব দেখাত।

নারাণ ম্যাট্রিক একজামিন দিয়ে স্কলারশিপ পেলে। গ্রামের লোক এই দুষ্ট হাড় জালানো ছেলেটার কৃতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গেল, "আমি নিশ্চয় বলতে পারি ছোঁড়া ফাঁকি দিয়ে পাস হয়েছে, নইলে ও কখনও পাশ করতে পারে ?"

সুদাম ভাইকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চোখের জলে তার মাথাটা ভিজিয়ে দিলে। তার এত খেটে টাকা দেওয়া সার্থক হয়েছে, তার ভাই মানুষ হতে পেরেছে।

ভাইয়ের আলিঙ্গন হতে নিজেকে মুক্ত করে নারাণ আস্তে আস্তে বললে, "আর পড়ে অনর্থক টাকা নষ্ট করে কি হবে দাদা, এখন বরং ঘরের কাজকর্ম্ম দেখা যাক, কি বল ?"

সুদাম চমকে উঠে বললে "সে কিরে, ঘরের কাজকর্ম্ম কর্‌তে কে তোকে মাথার দিব্য দিচ্ছে বল দেখি, যে তুই এই বয়সে পড়া ছেড়ে দিতে চাস ? না, ওসব আবদার চলবে না নারাণ, তোকে পড়তে হবে। যে পোনের টাকা জলপানি পাচ্ছিস, আর আমি কিছু করে দিলেই তোর কলেজে পড়ার খরচ চলে যাবে। আমি তোকে টাকা দিচ্ছি, কলিকাতায় গিয়ে থাকার ঠিক করে আয়।"

ভাইয়ের প্রতি ভায়ের এতটা টান দেখে তারার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল, তার স্বামীর যেন সবই অস্বাভাবিক। সে একখানা কাপড় চেয়ে পায় না, ভাইয়ের জন্যে কয়েক জোড়া কাপড় এসে পড়ল।

সম্প্রতি তারার ভাই শ্রীমন্ত একখানি পত্রে নিজেদের সংসারের দুঃখ কষ্ট জানিয়ে ছিল। তার একটী মাত্র ছেলের ভার যদি পিসিমা পিসেমশাই নেয় তবে সে বেঁচে যায়—ইত্যাদি —ইত্যাদি।

পত্রখানা পেয়ে সুদাম একটী কথাও বলেনি, সে তখন নিজের ভাইয়ের ভাবনাতেই পাগল, স্ত্রীর ভাই, ভাইপোর কথা কে ভাবে?

ভাইকে আবার পড়ানোর প্রস্তাবে তারা একেবারে দপ করে জ্বলে উঠল, রুক্ষকণ্ঠে বললে,—"আর পড়িয়ে কি হবে, তোমার ভাই জজ হবে না মেজিষ্টার হবে? এই যে এত টাকা ঢাল্‌লে এর দুটো পেলে যে আমার ভাই, ভাইপোরা বাঁচত। বলি,— তোমার ভাইটী তোমার কাছে যেমন, আমার ভাইটী ও আমার কাছে তেমনি,—তা জানো-তো? ঠাকুর পোর এখন বয়েস হয়েছে, নেহাৎ ছেলেমানুষ তো নয় যে, কিছু বুঝতে পারবে না! এই যে মানুষটা ভুতের মত মাঠে খেটে ধান করে, সেই গুলো বিক্রি করে যে ওর পড়ার খরচ চালাতে হয় সেটা তো বোঝে। এখন কোথায় দাদার হাতের কাজ নিয়ে দাদাকে একটু সুখী করবার চেষ্টা করবে তা না করে দাদার বুকের

রক্ত জল করা টাকা নিয়ে এই যে বাবুগিরি করে বেড়াবে এই কি ভাল হবে না কি ?

নারাণের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল, বড় আশায় তার বুকটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেই আশার মূলে তারা কুঠারাঘাত করলে।

সুদাম চুপচাপ বসে তামাক টানতে লাগল। সে জানত তারা নেই, একটা কথা বললে সে এখনি দশকথা শুনিয়ে দেবে। কাল রাত্রের বক্তৃতার কথা মনে পড়ল। সাতমাস গর্ভবতী সে,—যে শিশুটী তাদের সংসারে আসছে, তার ভবিষ্যৎ চিন্তায় এখনি সে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে বলছিল,—"এতদিন সন্তান হলে তোমার ঘর উঠত,—তাদের খেতে পর্‌তে দিতে না ভাইকে পড়বার খরচ দিতে বল দেখি ? এখন যা কিছু আছে সব যদি এমনি করে নষ্ট করে—যে আসছে সে খাবে কি, পর্‌বে কি ? এখন হতে ভবিষ্যৎ না ভাবলে এর পর আর ভাববে কবে ?"

সুদাম যে ভবিষ্যৎ চিন্তা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন ছিল এ কথা ঠিক নয়। সে জানত যদি সে কোনক্রমে তারা ভাইটীকে মানুষ করে তুলতে পারে, তারপর ভবিষ্যতের পথ ও তার কাছে সরল, সুগম হয়ে যাবে।

কথাটা কাল রাত্রে যে বলবামাত্র তারা তাকে চেপে ধরেছিল, —"হঁ্যা গো হঁ্যা, সব কাকাকেই জানি ওই তোমাদেরও কাকা

ছিলেন না, সব বিষয় ঠকিয়ে গেছেন, চাকরের মত খাটিয়ে নিয়েছেন। আমার ছেলেপুলেদেরও যে সেই দশা হবে তা আমি এখনই বেশ বুঝতে পেরেছি। সংসারের নিয়মই এই যে, তুমি যার জন্য সর্ব্বস্ব দেবে, সে তোমার বুকে ছুরি বসাতেও পেছ্‌পা হবে না।”

কথাটা যে সত্য তা সুদাম মর্ম্ম দিয়ে অনুভব করেছিল, তবু সে কিছুতেই মানতে চায় নি, তার কাকার মতই নারাণ তার সন্তানদের সঙ্গে ব্যবহার করবে।

তার সঙ্গে অনর্থক একটা ঝগড়া বাধনোর ইচ্ছা তার ছিল না, সে তাই চুপ করে গেল।

চুপি চুপি এক বিঘে জমী রামসদ্দারের কাছে পঁচাত্তর টাকায় বিক্রয় কয়ে সেই টাকা দিয়ে নারাণের কলিকাতায় যাত্রার আয়োজন করে দিলে। নারাণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দেখতে লাগলতার জন্যে তার দাদার কত লাঞ্ছনা, কত নিগ্রহ।

কলকাতায় যাওয়ার সময় সে তার দাদার পায়ে মাথা রেখে ছোট শিশুর মতই উচ্ছসিত ভাবে কেঁদে বলল, “মানুষ না হয়ে আর ফিরব না দাদা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন মানুষ হতে পারি, তোমার কষ্ট দূর কর্‌তে পারি।

সুদাম চোখের জল গোপনে মুছতে মুছতে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল, একটী কথাও সে বলতে পারলে না।

জমী বিক্রয় করার কথাটা গোপন রইল না, এক কান, দুই কান হতে তারার কানেও এসে পৌছাল।

তারা চীৎকার করে কেঁদে নিজের অদৃষ্টকে সহস্র ধিক্কার দিয়ে বাড়ীটাকে মাথায় করে তুললে। স্বামীর মনে এতও ছিল, তাকে নয়, তার সন্তানকে পথে বসানোর চেষ্টা।

সুদাম প্রথমে কথা বলে নি, যখন তারা চীৎকার করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তার স্বর একেবারে খাদে নেমে গিয়ে শুধু চোখ মোছাতে পরিণত হল, তখন আস্তে আস্তে বললে,—"না হয় মনে কর না বড় বউ—নারাণের ভাগের জমীই বিক্রি করেছি। সে ও চুলচেরা অর্দ্ধেক-জমী ভাগ পাবে-তো একদিন, সেদিন সে কম পাবে।"

তারা গর্জ্জে উঠল—"হ্যাঁ, তা আর হতে হচ্ছে না, সে দেখা যাবে। ওই ভাই সেদিন যদি সমান ভাগ না নেয় তো কি বলেছি। জানা আছে সবাইকে, তোমার মত নিরেট মুর্খ তো কেউ নয়।

নিরেট মূর্খ লোকটী চুপ করে রইল, বোকামীর পরিচয় আর দিলে না।

*   *   *

দিনের পর দিন যেতে লাগল। ভগিনীর সন্তান সম্ভাবনা এই অছিলায় শ্রীমন্ত সপরিবারে ভগ্নিপতির বাড়ীতে এসে উঠল,

কারণ এ সময়ে লোকের দরকার। কথা বলবার লোক পেয়ে তারা বেঁচে গেল ; স্বামীর মূর্খতার পরিচয় ভাইকে দিয়ে সে কেঁদে ভাষাতে লাগল। চতুর শ্রীমন্ত ভেবে দেখলে—আসতে আসতে সুদামকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা তার উচিত নয়।

তারার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তারার সংসারের দিকে দৃষ্টি আরও বেশী করে পড়ল, ভবিষ্যৎ খুব ভাল করে ভাবতে হল।

নারাণ অনেক দিন আসে নি, সুদামের মনে সেই কথাটী জাগত—সে বলে গেছে মানুষ হয়ে আস্‌বে। সুদাম চোখের জল রাখতে পারত না। মনে পড়ত—সেই ছোট ভাইটীর কথা—তখন তাদের মাঝখানে প্রাচীর তুলতে আর কেউ ছিল না। ব্যথা পেলে দুই ভাই দুই ভাইকে জড়িয়ে ধরত, একজন কাঁদিলে আর একজন তার সঙ্গে কেঁদে ফেলত। তখন কোথায় ছিল স্ত্রী,—কোথায় ছিল পুত্র।

শিশুটী খেলা করত, তারা সানন্দে স্বামীকে তার খোকা দেখাত ; তার খেলা দেখতে দেখতে সুদাম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, তার মুখের কৃত্রিম হাসি মিলিয়ে যেত, বুকভাঙ্গা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে যেত। তারা লোকের কাছে দুঃখ করত,—মা গো মা. বাপ হয়ে ছেলেটাকে দুই চক্ষু দিয়ে দেখতে পারে না।"

নারাণ মাঝে মাঝে পত্র দিত।

সেদিন সকালে সুদাম জন মজুর নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল, পথেই দেখা হল নলিন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে।

আগে ও পরে

"ওহে সুদাম, নারাণের খবর পেয়েছ ?

সুদাম বলিল, "হ্যাঁ, কিছুদিন আগে তার পত্র পেয়েছি। এর মধ্যে পত্র পাইনি। তুমি কলকাতায় গিয়েছিলে নাকি, তার খবর পেয়েছ,—সে ভাল আছে তো।

নলিন বললে, "ভাল আছে বই কি। তার যে বিয়ে এই সামনের বার তারিখে। খরর টবর দেয়নি বুঝি ?"

"বিয়ে,—কার বিয়ে ?"

বিস্ফারিত চোখে সুদাম নলিনের পানে চাইল।

নলিন বললে, "নারাণের বিয়ে! একজন খুব বড় জমীদার তাঁর এক মাত্র মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিচ্ছেন, শুনলুম' তাকে নাকি ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেতে পাঠাবেন বিয়ের পরই। আশ্চর্য্য, এ কালের সব ছেলেগুলো হল কি ? বাপ, ভাই কাউকে খবর না দিয়ে নিজেরাই বরকর্ত্তা হয়, বর হয়, ব্যস, সব নিজেরাই করে ফেলে ও তো সেই নারাণ ছোড়া, ওর দ্বারা এ রকম কাজ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।"

সুদাম নিষ্পলক নেত্রে শুধু তার পানে তাকিয়ে রইল। নারাণ,—তার বড় স্নেহের নারাণ যে, এমন ভাবে তাকে না জানিয়ে বিয়ে করবে, সে যে বিলেত যাবে এ কথাটা যেন সে মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বাড়ীতে ও খবরটা কেমন করে গিয়ে পৌছিল, তারা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে,—"কেমন, আমি আগেই

বলি নি—আগে একটু চোখকান ফুটুক, তারপর তোমায় কলা দেখাবে। আমি জানি সে কেমন ছেলে, তাকে আমি যতটা চিনি এতটা আর কেউ চেনে না। এই যে নিজে নিজেই কর্ত্তা হয়ে বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করছে, কই, একবার জানাতে পারলে? এখনই যার এই—এর পরে সে তোমায় দেখবে,—হায়-রে আশা। সে সেখানে তোমায় নিয়ে যেতে লজ্জা বোধ করে তা জানো? তোমার মত চাষাকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিতে সে লজ্জা, ঘৃণা বোধ করে, তার মত বাবু আগে হও, তারপরে তাকে ভাই বলে পরিচয় দিতে যেয়ো।"

সুদামের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, মাথা নিচু করে সে শুধু ভাবতে লাগল—কথাটা সত্য কি, নারাণ কি যথার্থই তাই করবে, না, এ অসম্ভব, এ কখনই হতে পারে না। সেই নারাণ, সে কি তাকে অন্য লোকের মত চাষা বলে ঘৃণা করতে পারে? সে যে তার ভাই, তার বড় আপনার, জগতের চেয়ে প্রিয়।

যে দিন সুদাম যথার্থ খবর পেলে সত্যই নারাণের বিয়ে, সে দিন সে আর উঠল না। তারা বারাণ্ডা হতে মনের সাধ মিটিয়ে কথা বলতে লাগল, আজ তারার সেই সব তীব্র কথা তার কান দুইটাকে ছুঁয়ে যেতে লাগল মাত্র, ভেতরে ঢুকতে পারল না। আজ তার বুকে যে আঘাত লেগেছে, অন্য যে কোন আঘাত তার কাছে আঘাত বলে গণ্য হতে পারে না।

জমিদারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে নারাণের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়েতে নারাণ কাউকেই খবর দেয়নি, তার বড় দাদাকে পর্য্যন্ত জানালে না তার বিয়ে হল। বড় অভিমানে তার বুকটা ভরে উঠেছিল, এ অভিমান দাদার পরে নয়,—বউদির পরে।

জমীদার ঠিক তারই মত একটি ছেলে চেয়েছিলেন—যাকে তিনি একেবারে নিজের করে নিতে পারবেন। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল এমনি একটি ভাল ছেলেকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিলেতে উচ্চ শিক্ষার্থে পাঠাতে পারেন।

নারাণের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। তার সুন্দর আকৃতি, প্রতিভাপূর্ণ চোখ দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে পারবে এই ছেলেটা। তিনি নারাণের দাদাকে খবর দিতে চাইলে, নারাণ প্রবল আপত্তি করলে, জানালে—তার দাদাকে খবর দিলে সে বিলেতে যেতে পাবে না, দাদা তাকে যেতে দেবেন না। প্রকাশ বাবু আর খবর দিতে পারলেন না।

নারাণের বন্ধুরা নারাণকে ঠাট্টা করতে লাগল, "দেখ ভাই, আঙ্গুল ফুলে যেন কলাগাছ হয়ো না ; বিলেত হতে ফিরে যেন আমাদের ভুলে যেয়ো না।"

নারাণ তাদের কথায় শুধু হাসত।

তার মনে নিদারুণ অভিমান, বউদির কথাগুলো তার মনের মধ্যে রক্তাক্ষরে গাঁথা ছিল! তার দাদা তাকে বড় ভালবাসেন, সেই জন্য তাঁকে কত না লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। হায়রে,

শুধু তার জন্যেই না তার ভাল মানুষ দাদাকে কত না নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়।

তার মনে হ'ল একদিন বউদি দাদাকে ভাত দেয়নি, যেদিন তার দাদা তার জন্যে কাপড় জামা কিনতে সহরে গিয়েছিলেন। ভাই কলকাতায় পড়তে যাবে দাদার মনে কি আনন্দ। সকলকে বলে বেড়াচ্ছেন,—শুনেছেন, আমাদের নারাণ "এস্কোলার শিপ" পেয়ে পাশ কয়েছে। "এস্কোলার শিপ" পাওয়া কি মুখের কথা, যে সে ছেলে কি পেতে পারে?"

দাদা সহর হতে যখন ফিরে এলেন, তখন বেলা তিনটা বেজে গেছে। ক্ষুধার্ত্ত দাদা ভাত চাইলেন, বউদি বল্‌লেন, "ভাত তো নেই; ভেবেছিলুম তুমি সহর হতে খেয়ে আসছ, তাই ভাত রাখি নি।"

কি ধৈর্য্য তার দাদার, দাদার খাওয়া হলনা দেখে সে ছটফট করতে লাগল, কিন্তু দাদার মুখের ভাব একটুও পরিবর্ত্তন হল না। সারাদিনটা উপবাস করলেন, ও রাত্রে একবার ভাত খেলেন।

তাকে স্নেহ করা ও যেন দাদার প্রকাণ্ড একটা অপরাধ। দাদা বউদির সামনে তাকে একটা কথা বল্‌তে পারেতেন না; আড়ালে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখের জল ফেলে বল্‌তেন, তুই মানুষ হলে আমার সব দুঃখ ঘুচবে নারাণ, এমনি করে চাষার সঙ্গে চাষার মত মাঠে গিয়ে আমি আর খাটব না। আঃ, কবে যে তুই মানুষ হবি ভাই—"হ্যাঁ, দাদার কথা

সে রাখবেই, সে মানুষ হবেই। চুলোয় যাক্ তার সাহেব সাজার—সে বিলেত গিয়ে হয় সিভিল সার্ব্বিস পাশ কর্‌বে নয় ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। ভগবান তাকে সুযোগ এনে দিয়েছেন, এ সুযোগ সে কখনও হারাবে না।

বিয়ের মাস খানেক পরে সে একদিন বিলাত রওনা হয়ে গেল। যাওয়ার আগের দিন অনেক রাত জেগে শত ফোঁটা চোখের জলে ভিজিয়ে সে দাদাকে একখানা পত্র দিলে।

দাদা,

তোমার বড় স্নেহের ছোট ভাইটী আজ সাগর পারে চলল। সেখানে গিয়ে তোমার কথাই আমার মনে হবে দাদা, কারণ জীবনে যা কিছু ভাল তা পেয়েছি তোমার কাছে। আমায় ক্ষমা করো দাদা, আমি তোমায় কিছু জানালুম না, আমার বিয়ের খবর পর্য্যন্ত তোমায় দিই নি। দাদা আমার বড় আশা আমি মানুষ হব, আমার দাদাকে সুখী করব। আমি এই লক্ষ্য ঠিক রেখে যাব। আমার দাদা মাঠে মজুরদের সঙ্গে কাজ করবে আমি তা আর সহ্য করতে পারছি নে। যদি তোমায় সুখী করতে পারি জানব আমার শিক্ষা সার্থক, আমার জন্ম সার্থক।

দাদা, যখন এ পত্র পাবে আমি তখন জাহাজে থাকব। তুমি পত্র পেয়ে ছুটে এস না,—আমায় পাবে না, আমি তখন অনেক

দূর চলে যাব। আশীর্ব্বাদ কর যেন ভাইয়ের মত কাজ করতে পারি, তোমায় সুখী করতে পারি। ইতি

দাস নারাণ।

পত্রখানা যথাসময়ে সুদামের হাতে গিয়ে পড়ল। আড়ষ্টভাবে সে পত্রখানার পানে তাকিয়ে রইল, পত্রের ভিতরের অক্ষরগুলি সব যেন একাকার হয়ে গেল।

সোৎসুকে তারা জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি গা?"

সুদাম উত্তর দিলে না।

তার মনে জাগছিল নারাণের কথা। সে আজ কোথায়,—মানুষ হওয়ার প্রবল বাসনা বুকে নিয়ে অসীম সাগরের বুকে সে পাড়ি দিয়েছে কার জন্যে?

হতভাগ্য সুদামের দুই চোখ ছাপিয়ে টপ টপ করে জল ঝরতে লাগল।

* * *

তার পর কয়েক বছর কেটে গেছে।

সুদাম এখনও তেমনি করেই মাঠের কাজ করে। তার ছেলেটী হাঁটতে পারে, দৌড়ায়, তার হাত ধরে মাঠে যেতে চায়।

সুদাম পথের পানে তাকিয়ে থাকে, কবে তার ভাইটী ফিরে

আসবে—এই আশা তার বুকে জেগে থাকে। দিন গুলো ব্যর্থ হয়ে রাতের কোলে ডুব দেয়, আবার উঠে আবার যায়, নারাণ আসে না।

আজ কয়বছরের মধ্যে একখানি পত্র ও সে দেয় নি। সুদামের বুকটা আকুল হয়ে ওঠে ছিঁড়ে পড়তে চায়, কি নিষ্ঠুর? এত করেছি, সব ভুলে গেল?

নিজে সে বাইরের খবর কিছু জানত না। বিলাতের নামই শুনেছে, কিন্তু সে যে কতদূরে, কি রকম দেশ তা কিছুতেই জানত না।

রমেশ চাটুয্যে কলিকাতায় থাকেন, অনেক দেশের খবর রাখেন। মাসে মাসে সুদাম তাঁর কাছে গিয়ে বসত, একথা সেকথার পর সে জিজ্ঞাসা করত,—"হ্যাঁ দাদা ঠাকুর, বিলেত এখান হতে কতদূর, কত ভাড়া দিলে যাওয়া যায়?"

রমেশ চাটুয্যে বিস্ফারিত চোখে বলতেন—"বিলেত? ওরে বাপরে, সে কি এখানে? সপ্তা তিন-চার নাকি জাহাজে থাকতে হয়, ভাড়াও বহুৎ,—সে দুচার টাকার কাজ নয়।"

অত্যন্ত নিরুৎসাহ ভাবে সুদাম বলত,—"পত্র দিলে যায় না দাদাঠাকুর?"

একটু ভেবে দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন,—"তা যেতে পারে, অনেক খরচ পড়ে। কিন্তু ঠিকানা কি আছে সুদাম সে তো পাড়াগাঁ নয় যে নাম দিলেই যাবে? দশটা কলকাতা এক করে

সেখানে একটা সহর, সেখানে কোথায় আছে কে, কে তার খবর রাখে?"

* * *

এক দিন ভট্টাচার্য্য মশাই নিজে এসে সুদামকে ডেকে বললেন, "নারাণের খবর পেয়েছ সুদাম? আমি শুনতে পেলুম নারাণ নাকি জেলার হাকিম হয়ে এসেছে, পরশু এসে কলিকাতায় পৌঁচেছে। কাল পথে দেখলুম, মোটরে যাচ্ছিল, দেখে সাহেব কি বাঙ্গালী বুঝতে পারলুম না। আমার ছেলে তাকে নারাণ বলে চিনতে পেরে আমায় বললে। উঃ, কি চেহারাই হয়েছে তার, রং একেবারে লাল টকটকে—"

নারাণ জেলার হাকিম হয়েছে, সে বিলেত হতে ফিরেছে, সুদাম আনন্দ রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে তখনি কলকাতায় ছুটে যায়, ভাইকে তেমনি করে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

তার আনন্দ দেখে তারা ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে বললে,—"আহা মরে যাই। ভাই হাকিম হয়েছে, সাহেব হয়ে এসেছে, তবে আর কি? ভাই, তাই একটা খবর দিতে পারলে না, একবার আসতে পারলে না? ওগো নারাণ আর সে নারাণ নেই। বিয়ের সময় পাছে চাষা ভাই গেলে লোকে ঠাট্টা করে সেই ভয়ে যে একটা খবর দেয়নি, সে সাহেব হয়ে এসে ওঁর খোঁজ নেবে! আবদার নাকি! সুদামের উচ্ছ্বসিত প্রাণটা হঠাৎ দমে গেল। তাই—তো, বিয়ের

সময় সে একটা খবর দিতে পারেনি, এখন সাহেব হয়ে এসে সে কি আর তাকে দাদা বলে ডাকবে? চোখের জল পড়তে পড়তে চোখেই শুকিয়ে গেল।

সেদিন সকাল বেলা—মজুরদের মাঠে পাঠিয়ে স্থদাম নিজেও মাঠে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল—

রমেশ চাটুয্যের ছেলে ভবেশ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে, কাকা মশায়, তোমাদের বাড়ী সাহেব আস্‌ছে তার সঙ্গে একটা গাড়ী আছে। তোমরা শীগ্‌গীর পালাও। নইলে সব ধরে নিয়ে যাবে।

তারা আর্ত্তনাদ করে উঠল,—"ওমা সেকি বাবা গো সাহেব কোথা হতে এল?"

মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। স্থদাম স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বললে, "আগেই কান্না স্থরু করোনা বলছি; আমি দেখছি গিয়ে কে এসেছে?"

বাড়ীর বার হতেই—দাদা, বলে ডেকে যে তাকে প্রণাম করলে সে তার অপরিচিত নয়, সে তার বড় পরিচিত। এই দাদা ডাকটি শুনবার জন্যে আজ বার বছর ধরে প্রত্যেকদিন সে ব্যগ্র-ভাবে পথ পানে চেয়ে আছে।

'অাঁ, নারাণ!—এসেছিস?"

দুই বাহু দিয়ে স্থদাম নারাণকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধর্‌লে. তার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে' নারাণের মাথায় পড়তে

লাগল। দাদার স্নেহপূর্ণ বুকের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে নারাণ ক্ষুদ্র বালকের মত কাঁদতে লাগল। আজ বার বছরের রুদ্ধ আবেগ সে মুক্ত করতে পেরেছে, আজ সে কৃতকার্য্য হয়ে দেখাতে এসেছে সে মানুষ, সে শিক্ষিত সিভিলিয়ান হয়ে এলেও সে এই দাদার ভাই,এই কুটীর তার জন্মভিটে।

"নারাণ—"

নিজের চোখ মুছে নারাণের মুখখানা উঁচু করে ধরে সুদাম রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—"কাঁদছিস্ কেন ভাই ? চল বাড়ীর ভেতর যাই।"

নারাণ চোখ মুছে বললে, "আজ কয় বছরের মধ্যে একটা দিন তোমায় ভুলতে পারি নি দাদা, তোমায় সুখী করব এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। আজ আমি আই-সি-এস পাস করে সসম্ভ্রমে দেশে এসেছি, আজ আমি কত বড় হয়েছি, কিন্তু তুমি যেন আমায় পর ভেবনা দাদা, তুমি আমায় তেমনি করে বুকে টেনে নিয়ো। তোমায় আমি সুখী করব এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

সুদামের চোখে আবার জল আসিল।

সে পথের উপরকার গাড়ীর পানে তাকিয়ে বললে, "গাড়ীতে কে ?"

নারাণ মুখ নাবিয়ে বললে,--"তোমার ভ্রাতৃবধু।"

"বউ মা এসেছেন ? হ্যাঁ, আমার এই ঘর, এই জায়গা—এর মধ্যে বউ মাকে আনলি ?

সুদাম আর কথা বলতে পারলে না।

লীলা গাড়ী হতে নেমে এল। দূর হতে ভাসুরকে প্রণাম করলে। স্বামীর কাছে সে তার দেবোপম ভাসুরের পরিচয় পেয়েছিল, ভক্তি, শ্রদ্ধায় তার অন্তর ভরে উঠেছিল।

ভাই, ভাতৃবধূ সহ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে করতে মহানন্দে সুদাম তারাকে বললে, "বড় বউ, শিগগির করে মাদুরটা পেতে দাও, আমার কুঁড়ে ঘরে আমার মা লক্ষ্মী এসেছেন, আমার হাকিম ভাই এসেছে। আজ আমার মহাদিন। আজ আমি চাষা নই বড় বউ, আজ আমি জেলার হাকিমের বড় দাদা!

তারা তাড়াতাড়ি মাদুর বিছিয়ে দিলে। প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। লীলা তার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করতে যেতেই তার জ্ঞান ফিরে এল, সে দুই হাতে লীলাকে জড়িয়ে ধরলে। আজ ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন দেখে তার অন্তর গলে গিয়েছিল, সে যে কত কথা বলেছে এই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, তাই ভেবে ভারি অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিল।

সজল চোখে লীলা বললে, "দিদি, আমাদের এ ঘরে যায়গা দেবে তো?"

আর্ত্তকণ্ঠে তারা বলে উঠল,—"আর লজ্জা দিয়ো না ভাই ছোট বউ, আমার খুব জ্ঞান হয়েছে।"

নারাণ ও তার স্ত্রীর আসার কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে দলে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ এসে সুদামের বাড়ী ভরে ফেললে।

বউদি বিয়ের কথা বলামাত্র সমর লাফিয়ে উঠল "না এ কথাগুলো হবে না। বিয়ে অমনি মুখের কথা নাকি তাই যেমনই বলবে বিয়ে কর, তখনি বিয়ে করব?"

বউদির ভারি হাসি আসছিল, সে হাসি চেপে রেখে বললেন সে কি ভাই ঠাকুর-পো? আমি এমন কথা বলছিনে যে তুমি একটা লোককেও না জানিয়ে চুপি চুপি যাবে, আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে চলে আসবে—ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। সত্যিই তো, বিয়ে কি অমনি মুখের কথা? বিয়েতে কত লোক আসবে, কত বাজনা বাজবে, কত লুচি, ক্ষীর, দই, সন্দেশের ছড়াছড়ি হবে, কত রঙিন কাগজের ছড়াছড়ি হবে, তবে তো বিয়ে। দেশের সব লোকে যদি না জানতে পারলে, তবে সে আর বিয়ে কি? না ভাই, সত্যি আমাদের সে ইচ্ছে নয়। তুমি হচ্ছো আমার ছোট্ট দেওরটী, তোমার বিয়ে জাঁক-জমকের সঙ্গে দেওয়া চাই বই কি।"

সমর উল্টে চাপ পেয়ে মুখখানা বিকৃত করে বললে "ধান ভানতে শিবের গীত; তোমার সেই কথা বললুম আমি?"

বউদি নেহাৎ নিরীহের মত মুখখানি করে বললেন তাই তো বললে ঠাকুর-পো? তুমি বললে—বিয়ে কি অমনি

মুখের কথা নাকি, আমিও তাই বলছি—তা কি হতে পারে কখনো? তোমার বন্ধুবান্ধব সব আছে বেচারারা কত আশা করছে তোমার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যাবে। তুমি সবার বিয়েতে বরযাত্রী যাও; ফাকি দিয়ে তোমার বরযাত্রী হওয়াটা তারা পছন্দ করে না, তাই তারাও ইচ্ছে করে তোমার বিয়েতে বরযাত্রী যাবার জন্যে। তারপর তোমার দাদার বন্ধুবান্ধব আছে, মক্কেল গুলি আছে। আমার কতকগুলি চেনা মেয়ে আছে, তারাও আসবে, আর তাদের সঙ্গে অবশ্য কতকগুলি ষষ্ঠির দাসদাসীও আসবে, আরও দেখ—ধোবা, নাপিত, ঝি চাকর বাইরের লোক ও—"

সমর হাত দুখানা ভীষণ রকম দুলিয়ে বলে উঠল,—"রাখো, রাখো। তোমার পায়ে পড়ি বউ দি, ও সব লিষ্ট আমায় দিয়ো না, আমার মাথা ঘুরছে শুনে।"

ব্যস্ততা দেখিয়ে বউদি বললেন "মাথা ঘুরছে? তবে সাংঘাতিক তো। ওরে অনি, চট করে শেলফের ওপর হতে ইউডিকলোনের শিশিটা নিয়ে আয় তো, আহা তা তো হবেই ভাই ঠাকুর-পো, এতে তো মাথা ঘুরবারই কথা। আমি শুনেছি, অনেকেরই মাথা এমনি করে—ঘোরে বিশেষ যারা কবি তাদের তো—"

ইতিমধ্যে বউদির মেয়ে অনিলা সত্যই ইউডিকলোন এনে হাজির করলে। সমর হাতজোড় করে বললে "তোমার পায়ে

পড়ি বউদি, আর ইউর্ডিকলোন, দিতে হবে না মাথায়। এমনিতেই রক্ষা নেই; ইউডিকলোন মাথায় দিলে—"

বউদি হাসি চেপে বল্‌লেন "তবে থাক, ওতে যদি আবার মাথা ধরে ওঠে; বলাতো যায় না, তা হলে ঠাকুর-পো—

সমর অতিরিক্ত রেগে উঠেছিল, বল্‌লে আবার তা হলে কি? "আমি বিয়ে টিয়ে করতে পারব না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তোমার শুনতে হয় শুনো, না শুনতে হয় চুপ করে থাক।"

বউদি মুখখানা অন্ধকার করে বল্‌লেন "কিন্তু মেয়েটী যা ভাই, সে আর বলব কি, দেখলে বুঝতে পারতে।"

সমর মাথা নেড়ে বলে উঠল "আর বুঝে দরকার নেই, ঢের বুঝেছি। এর চেয়ে বেশী বুঝতে গেলে আমার আর বাঁচতে হবে না।"

বউদি সে সময়টা আর বেশী চাপ দিলেন না।

সমর ছিল আজকালকার দিনের একজন নব্য কবি।

কবির যা যা থাকা দরকার তার সে সবই ছিল। তার মাথার মাঝখানে সিঁথি, দুদিকে কোঁকড়া চুল, তার চোখে চশমা, দিনের মধ্যে কুড়িবার সে আয়নায় মুখ দেখছে, তার চুল ঠিক করছে। তার পা হতে মাথায় চুল পর্য্যন্ত ভরা ছিল কেবল কবিতা। সে জেগে প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক ঘটনাতে, প্রত্যেক কথাতে কবিতা দেখত, সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত তাও

সেই কবিতা। খেতে বসে কবিতা ভাবতে ভাবতে এমন অন্যমনা হয়ে যেত যে তার হাতের ভাত হাতেই থেকে যেত; বউদি হাসতেন, বকতেন, তখন সে ভারি সচকিত হয়ে উঠত।

চব্বিশ বছর বয়েস হল তার, এখন সংসারি হবার সময় আর কি কবিতা নিয়ে ভুলে থাকলে দিন চলে? এরকম করে খাতাখানি সামনে রেখে কলমটী হাতে নিয়ে হাঁ করে আকাশ পানে তাকিয়ে থাকা, মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা, এ সব বউদি অত্যন্ত অশুভলক্ষণ বলেই জানলেন। তিনি তাই দেওরটীর বিয়ে দেবার জন্যে ঘুরছিলেন।

সমরের বড় ভাই বিকাশ উকিল ছিল। সে বেচারা ভাইয়ের দিকে তাকাবার বড় একটা অবকাশ পেত না। সকাল হতে তাকে ঘিরে বসত মক্কেল; যা তা করে নাকে মুখে চারটী ভাত ঠেসে সে দৌড়াত কোর্টে, ফিরে আসতে তার কোন দিন রাতও হয়ে যেত। স্ত্রী যখন ভাইয়ের বিয়ে দেবার জন্যে বিশেষ পীড়াপিড়ী আরম্ভ করলে, তখন বিকাশ মাথা চুলকিয়ে খানিকটে উস্কে, হাঁ করে শেষে বললে সমরকে ডাক একবার দেখি।"

স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল "আহা, দেখবেন ভাইটী কত বড় হয়েছে। তা দিচ্ছি ডেকে। আমার আর কি, বিয়ে না দাও নাই দেবে। এর পর যেদিন লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে যাবে সন্ন্যাসী হয়ে—"

দুই চোখ কপালে তুলে বিকাশ বললে "সন্ন্যাসী হবে? কিন্তু সে তো বিয়ের কথা একদিনও বলে নি।"

স্ত্রী হাসি চেপে বললে "কি করে যে ওকালতি করে খাও তা আমি বুঝতে পারিনে। তোমার মাথায় যদি একটু সাংসারিক বুদ্ধি থাকে। জানো কেবল আইন আর আদালত, আর কিছু জানো না। ভাই তোমায় এসে বলবে—দাদা, আমি বিয়ে করব—এ নাকি বলতে পারে কখনও?

সে দিন কোর্ট হতে বিকাশ বাড়ী ফিরল সকাল সকাল, উপরে ওঠবার সিঁড়িতেই সমরের সঙ্গে দেখা। সে তখন খুব তাড়াতাড়ি একখানা কবিতা ভরা খাতা নিয়ে নেমে যাচ্ছিল, তার বন্ধুরা আগেই খাতাখানা দেখবে, সেও তার কবিতাগুলি তাদের শুনিয়ে অসীম আনন্দ পাবে, তাই।

বিকাশ তার সামনে পড়ায় সে থতমত খেয়ে দাঁড়াল অনেকদিন দাদার সামনে সে পড়ে নি, দাদাকে কি জানি কেন-বরাবর সে এড়িয়ে চলত। বিকাশ ভাল করে একবার তার পানে চাইল, সত্যিই তো, আর বিয়ে না দিয়ে রাখা ভাল দেখায় না।

আপন মনে সে মাথা নেড়ে বললে "হুঁ, আজকালই বিয়েটা দেওয়া দরকার বটে।"

কথাটা আস্তে বললেও সমরের কাণে পৌছাল, তার মুখখানা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল, তার পরে সে পাশ কাটিয়ে পালালো।

যে মেয়েটিকে বউদি ঠিক করেছিলেন, বাস্তবিকই সে

মেয়েটী বেশ সুন্দরী ছিল, প্রায়ই সে এ বাড়ীতে আগে আসত, বড় হয়ে পর্য্যন্ত বড় একটা আসত না। সে দিন সমরকে দেখানোর জন্যেই বউদি হিমানীকে নিমন্ত্রণ করলেন।

কিন্তু যাকে দেখানোর জন্যে নিমন্ত্রণ ব্যাপার, সে সেদিন আগেই বাড়ী হতে পিঠটান দিলে। বেলা আটটায় ঘুম হতে উঠে এককাপ চা খেয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে কি কাজে যেতে গিয়ে দেখলে সেখানে ব্যাপার আজ বড় গুরুতর। অন্য দিন বামুন ঠাকরুণই যা হয় রাঁধেন, আজ বউদি পর্য্যন্ত গিয়ে যোগ দিয়েছেন। কোমরে কাপড় খানা জড়িয়ে তিনি মহাউৎসাহে একটা উনানে তরকারী চড়িয়ে দিয়েছেন ;

সমর আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "ব্যাপার কি বউদি ?"

বউদি জানতেন হিমানী আসবে শুনলেই সে পালাবে, তাই তিনি বললেন "আজ পাশের বাড়ীর সাবজজ বাবুদের সব নেমতন্ন করেছি, তাই।"

সমর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে "হঠাৎ যে, মানে" ?

বউদি তরকারী নাড়তে নাড়তে বললেন" মানে এমনি।"

সময় চিন্তিত মুখে বললে, "সাবজজ বাবুর তো মেয়ে-টেয়ে নেই, তবে—হঠাৎ তাঁর নেমতন্ন হবার কারণ কি ? আজ বোধ হয় নিরঞ্জন বাবুদের বাড়ীর সকলের ও নেমতন্ন ?"

বউদির মুখের পাশে হাসির রেখা লেগেছিল, মুখখানা তবু অপ্রসন্ন করবার মিথ্যে চেষ্টা করে তিনি বললেন "রামোঃ;

নিরঞ্জন বাবুদের বাড়ীতে বলবার আমার ভাবি দায় পড়েছে। তুমি তো পষ্ট জবাব দেছ বিয়ে করবে না সেখানে, তবে—"

আর কথা না শুনেই সমর বাইরে চলে গেল।

অনিলাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলে "নিরঞ্জন বাবুদের বাড়ীও নেমন্তন্ন হয়েচে নাকি রে অনি ?"

অনি উত্তর দিল "হ্যাঁ তা হয়েছে তো ?"

আর একটী কথা না বলে জামাটা গায়ে দিয়ে জুতা পরে সে অনিকে বলে গেল "আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ী নেমতন্ন রাখতে চললুম, তোর মাকে বলিস।

এ রকম বিয়ের উপর সে অস্বাভাবিক চটে ছিল। সে চায় একটু অস্বাভাবিকত্বের মধ্যে মিলন্। সে কবি মানুষ, সাজিয়ে এনে দেখানো—সেই একঘেয়ে প্রথা তার কাছে একেবারেই নরকে যাবার হেতু। সে বলে বিপদে সৌন্দর্য্য দেখাই আসল জিনিষ, সেই ত্রস্ততার মধ্যে যে স্বকুমার সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে তাতেই মিলন করিয়ে দেয়। সে তার প্রিয়তমাকে দেখতে চায় কবির চোখ দিয়ে, ভাবুকের চোখ দিয়ে, সেই সেকেলে মামুলী ধরণের দেখা একেবারেই তার ইচ্ছা নয়। দেখার জন্য দেখা চাই সে চোখের দেখা নয়; প্রাণে-প্রাণে চেনাচেনি।

একে সাজিয়ে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে যেন একখানি কাঠের মতই ; না পারবে চোখ তুলে চাইতে, না পারবে একটা কথা বলতে। সে ছোট বেলায়

হিমানীকে দেখেছিল, তখনকার কথা আলাদা, তখন ভাবুকের চোখ ছিলনা।

তার বিয়ের পাত্রী সে নিজে খুঁজে নেবে, তার জন্যে বউদির, দাদার এত মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

অত্যন্ত রাগ করেই সে বাড়ীর বার হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, চারিদিক বেশ অন্ধকার মত হয়েছে, পথে পথে আলো জ্বলে উঠেছে, পথের অন্ধকার দূর হয়েছে।

সেই সময় সমর মন্থর গতিতে বাড়ী ফিরছিল। বেচারা আজ সারাদিনটা নিজের দোষে কষ্ট পেয়েছে। খাতাখানি আর একটা পেন নিয়ে সে বেরিয়েছিল, সহর ছাড়িয়ে গিয়ে কোথায় একটা বাগানে পুকুর পাড়ে গাছের তলায় বসে কবিতা রচনা করছিল। আজকের কবিতায় বেশ জোর ছিল, তার মনের কথাগুলো আজ সে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল, নিজের লেখা নিজেই পড়ে সে একেবারে মুগ্ধ হয়েছিল। বাঃ, সে এমন লিখতে পারে তা তো সে জানে না। আজ সে এই লেখাগুলো বউদিকে শুনাবেই যদি এতেও না বউদির চোখ ফোটে তবে সে একেবারেই নাচার।

উদরে ক্ষুধা দেবতা বিষম উপদ্রব করেছেন সারাদিন যাতে বেচারী কবিকে ও কাব্য ফেলে দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে এদিক ওদিক করতে হয়েছিল। কোথায় কাঁচা পেয়ারা কোথায়

কাঁচাডাঁসা কুল—(তখন মাঘ মাসের প্রথম) তাও আবার লবণ ছিল না। যাই করে হোক—উদর দেবতা কথঞ্চিৎ শান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এটা ঠিক কথা বাড়ীতে আজ খাওয়ার আয়োজনের কথা ভেবে তাকে বিলক্ষণ অনুতপ্তও হতে হয়েছিল, যতটা রাগ—সব পড়েছিল গিয়ে হিমাণীর ঘাড়ে। সেই মেয়েটারই দোষ। কেন বাপু, সমর ছাড়া আর কি ছেলে নেই? তার মত হাজার বি, এ, এম, এ রয়েছে, তাদের কাউকে বিয়ে করবে না? অন্যায় আবদার আর কাকে বলে?

সাত বছর আগেকার দেখা সেই মেয়েটীকে সে মনে করে দেখলে, তখন তার বয়েস ছিল বছর নয় দশ কোঁকড়া কোঁকড়া নিকষ কালো চুলগুলো তার পিঠে ছেয়ে থাকত, টুলটুলে মুখখানা ভরা থাকত একটা মিষ্টি সৌন্দর্য্যে। ভারি দুরন্ত মেয়ে ছিল সে; সমরের বই নিয়ে, ছিঁড়ে, লুকিয়ে কি কাণ্ডই না করত। সেই দুরন্ত মেয়েটাকে নাকি বিয়ে করা যায়? বউদি, দাদা, নিশ্চয়ই ক্ষেপেছেন।

ভাবতে ভাবতে সমর ফিরছিল। সামনের পথের বাঁক, একখানা ঘোড়া গাড়ী তীর বেগে পথ দিয়ে ছুটে আসছিল, সেই বাঁকের মুখ ঘুরতে গিয়ে গাড়ীখানা পড়ে গেল।

গাড়ীর মধ্যে যত ছেলেমেয়ে ছিলেন তাঁরা চিৎকার করে উঠে ছিলেন, গাড়ীখানা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সব চুপচাপ। কোচম্যান ছিটকে খানিক দূরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, ঘোড়া

ছুটো হাঁফাচ্ছিল। সহরে পথ—দেখতে দেখতে অনেক লোক জমে গেল।

খাতা পেন ফেলে সমর লাফ দিয়ে পড়ে আগেই গাড়ীর দরজা খুলে ফেললে, আর কয়েকজন লোকের সহায়তায় গাড়ীটাকে উঠিয়ে আহতাদের বার করলে।

একটী মেয়ে আর একটী প্রৌঢ়া গাড়ীতে ছিলেন। প্রৌঢ়ার বেশী লাগে নি, ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে গেছলেন। মেয়েটীর মাথায় খুব চোট লেগেছিল, সে মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল।

প্রৌঢ়া সমরের হাতখানা জাপটে ধরে কেঁদে বললেন "বাবা, তোমায় আমি চিনি, আমার মেয়েটীকে দেখ, তাকে বাঁচাও আমায় দেখতে হবে না।"

মেয়েটীর মাথার একটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। রক্তধারার মধ্যে সে মুখখানি দেখাচ্ছিল বড় চমৎকার। এমন মুখ সমর কখনও দেখেনি, সে মুগ্ধের মত খানিকটা চেয়ে থেকে ডাক্তার ডাকতে দৌড়াল।

ডাক্তার এসে দেখে শুনে বললেন "ভয় নেই কিছু, মাথায় লেগেছে বলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, এখনি জ্ঞান হবে।"

উৎকণ্ঠাকুল ভাবে সমর বললে "রক্তটা বন্ধ হবে তো?"

ডাক্তার মাথায় ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বললেন "তার জন্যে ভয় নেই, রক্ত এখনি বন্ধ হয়ে যাবে।"

আহতার জ্ঞান শীঘ্রই ফিরে এল। সেই সময় তাঁদের বাড়ী

হতে লোকজন ও গাড়ী এসে পড়ল। মেয়েটিকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে প্রৌঢ়া নিজে উঠবার সময় সমরের হাত দুখানা ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "বাবা তুমি আমার যে উপকার করলে তা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।"

তাঁরা চলে গেলেন, সমরও বাড়ীর দিকে ফিরল, গোলমালে তার সেই কবিতা ভরা খাতা খানা যে কোথায় গেল খোঁজ করতেও সে ভুলে গেছল। তখন সে খাতা, কবিতা তার মনে ছিল না, মনে জাগছিল সেই মূর্চ্ছিতার সেই সুন্দর মুখখানা। এমন মুখ মানুষের হয় কখনও? কে সে হিমানী, এই মেয়েটীর এই অননুভূত সৌন্দর্য্যের একটু যদি পেত সে তবে ধন্য হয়ে যেত। ভদ্রতার খাতিরে সে প্রৌঢ়াকে তাঁর পরিচয় ও জিজ্ঞাসা করতে পারে নি, সে তাঁর পরিচিত কিন্তু তিনি তার অপরিচিতা। আহা, এই মেয়েটীর সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়—আঃ, তা হলে—?

মনে পড়ল—জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি যখন চাইলে, তার মা—সেই প্রৌঢ়াটী যখন তাকে দেখিয়ে বললেন "এই দেখ মা, এই বিকাশ বাবুর ভাই সমর, এই ছেলেটীই আমাদের বাঁচিয়েছে।' তখন মেয়েটীর মুখখানা লজ্জায় কি রকম লাল হয়ে উঠল, আর সে তার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

সেই মুখখানার কথা মনে করতে বুকের মধ্যে পুলকধারা বয়ে গেল। সময় কতক্ষণে সে পাঁচ মিনিটের পথ অতিক্রম করে বাড়ী এসে পৌছাল তা সেই জানে না।

আগে ও পরে

"কি ঠাকুর-পো—আজ এমন করে গা ঢাকা দেবার মানে?"

অত্যন্ত বেশী রকম চমকে উঠে সে থেমে বল্লে "গা ঢাকা? না, আমার আজ নেমতন্ন ছিল, তাই—"

বউদি মুখখানা অন্ধকার করে বললেন "নেমতন্ন একেবারে সারাদিনের মত—তারা যতক্ষণ আমাদের বাড়ী ছিল,—না? তোমার মুখ দেখেই জানতে পারছি কত নেমতন্ন খেয়েছ। যা হোক—ফাকি দিতে শিখেছ বেশ"।

সমর চুপ করে গেল।

বউদি সেদিন গিয়েছিলেন কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে, সময় একা নিজের ঘরে বসে লিখছিল।

আজ সে লিখছিল তার মানসীর জন্যে একটী কবিতা। সেই অপরিচিতা সুন্দরীটির খোঁজ সে আজও পায় নি। সে এই কবিতাটী লিখে মাসিকে ছাপাবে, তার মানসীর চোখে যদি পড়ে। যদি সে সেইদিনকার রক্ষাকর্ত্তার কথা ভুলে গিয়ে থাকে, এই কবিতাটি পড়লে নিশ্চয় মনে হবে।

সে লিখছিল—

চিনিতে কি পারিবে গো মানসী আমার—
কোন ভক্ত ঢালে পদে ভক্তি উপচার?
এখনো সাঁঝের বায় করে যায় হায় হায়
আবার কি সেই সাজ ফিরিবে গো এ ধরায়।

আমার প্রেমের ধারা পারিব কি ঢেলে দিতে
পুনঃ কোন ও মধু সাজে হৃদয়ে তোমার—
ওগো চির আকাঙ্ক্ষিতা মানসী আমার ?

"আচ্ছা ভাই ঠাকুর-পো, একবার শোন সে কথাটা বলছিলে ? তোমরা ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড করছ, বাইরে আমি যোগাড় করলুম—উল্টে কিনা আমায় বললে চোর ? একবার বলা না, কওয়া না—যেন কোথাকার কে ?"

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বউদি এতগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন। বেচারা কবির কবিত্ব ফুটতে ফুটতে থেমে গেল, হাতের পেন হাতেই থেকে গেল, নিবের ডগার কালীটুকু সব শুকিয়ে গেল। সে বেচারা মোটেই বুঝতে পারলে না সে কি করেছে কবে যে তার জন্যে তাকে এত গুলো কথা শুনতে হবে।

বউদি টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে এক নিমিষেই কবিতাটা দেখে ফেললেন, "এই যে অজ্ঞাতা নাম নিয়ে কবির একটা কবিতা ও বার হয়ে পড়ল। ওগো কবি, কল্পনা ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে একটু নেমে এস দেখি। এই অজ্ঞাতা লোকটি কে, শুনতে চাই।"

ব্যগ্র হয়ে খাতা খানা মুড়ে ফেলে সমর চোখের চশমা খুলে মাজতে স্বরু করলে, হাতে হাতে ধরা পড়ে সে উপযুক্ত জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। সে কথার ধাঁজেই জেনে ফেলেছে। বউদি সেদিনকার কথা জেনে ফেলেছেন।

বউদি উত্তর না পেয়ে বললেন "বলে ফেল না ঠাকুর-পো, ভয় নেই, আমি তোমার মানসীকে চিনলেও বলব না।"

নাকের পরে চশমা ভাল করে বসাতে বসাতে সমর বললে "মানষী আবার কি? যা মনে এল তাই লিখে ফেললুম। ও রকম কত "অজ্ঞাতা," কত "অপরিচিতা" আমার কবিতায় আছে।

সমর ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—"ইঃ, তাই তো, দুটা বাজে যে, আমার কাজ আছে, একবার সত্যেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

বউদি তার হাতখানা চেপে ধরে বললেন "লক্ষ্মী ভাইটী আমার, সত্যেন তো পালাচ্ছে না, কাল দেখা করো। তোমার অজ্ঞাতার পরিচয়টা আগে দাও। আচ্ছা আমিই বলি—"

মুখ ফিরিয়ে তিনি ডাকলেন "হিমু—"

উত্তর নেই।

"ওরে অনি, হিমানীকে ধরে আন তো—"

অনিলা হিমানীর হাতখানা ধরে টেনে আনছিল, সে দরজা চেপে ধরে দাঁড়াল, আর কিছুতেই এগুল না।

বউদি হাসতে হাসতে বললেন "এই দেখ তোমার সেই চিরইপ্সিতাকে ধরে এনেছি। হিমানীকে বিয়ে না কর ক্ষতি নেই, মানসীকে জীবন-সঙ্গিনী করতে বোধ হয় বিশেষ আপত্তি হবে না। এবার হতে সাজ পাবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া

খেয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, ঘরের মধ্যেই সাঁজ পাবে, বসন্ত পাবে, মলয় পাবে—আরও কত কি পাবে।"

হাসতে হাসতে হিমানীর হাত ধরে তিনি চলে গেলেন।

বলাবাহুল্য এর পর বাকি বিয়ে করতে আর আপত্তি করে নি, আর বউদিকে সাধতে ও হয় নি।

হাতের পাতের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া নিতাই বোন বিন্দুর বিবাহ দিল। রহিল কেবল তাহার ছোট কুঁড়ে ঘর খানি। নিতাই ভারি খুসি, ইহাতে তাহার দুঃখের কারণ কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

যেমন করিয়া হউক বোনকে সে ভাল ঘরে দিয়াছে, বিন্দু তো সুখে থাকিবে। সে যে মেয়ে, তাহাকে স্বামীর উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। স্বামীর যদি অবস্থা ভাল থাকে তবেই সে সুখী হইতে পারিবে, নচেৎ নয়। আর সে, সে তো পুরুষ, যেমন করিয়াই হোক নিজের জীবিকা সে নিজেই অর্জ্জন করিতে পারিবে। প্রতিদিন সে যদি মজুর খাটিয়া পাঁচ আনা ছয় আনা রোজগার করে তাহাই যে তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। একটা মানুষের পেট বইতো না। বোনটী তো তাহার দুঃখ পাইবে না।

আঃ কি কষ্টেই না বিন্দুকে সে মানুষ করিয়াছে। পিতা বহুকাল আগে, বিন্দু যখন মায়ের গর্ভে তখন মারা যান। তাহার পর বিন্দু যখন মাত্র তিন বৎসরের তখন মা মারা যান। সে আজ প্রায় এগার বার বৎসরের কথা। সেই ছোট্ট বোনটীকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছে সেই-ই।

নিজে রাত থাকিতে উঠিত, রাঁধিয়া বোনকে খাওয়াইয়া

নিজে খাইয়া কাজে বাহির হইত, ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহাকে খাওয়াইত। তাহার নিজের অসুখ হইলে সে তাহা গ্রাহ্যই করিত না, কিন্তু বিন্দুর সামান্য কিছু হইলে সে একেবারে সবদিক অন্ধকার দেখিত।

ন পাড়ার মহিম মণ্ডলের ছেলে নরেনের সঙ্গে যখন সে বিন্দুর বিবাহের সম্বন্ধ করিল, তখন তাহার গ্রামের সকলেই তাহাকে নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিল। মহিম মণ্ডলের অবস্থা বেশ উন্নত তাহার ছেলেটীও ম্যাটরিক্ পাস করিয়াছিল, কৈবর্ত্তদের মধ্যে এমনতর একটী ছেলে খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। সব রকমেই ছেলেটী ভাল, কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার পিতার যে থাঁই তাহাতে কৈবর্ত্তেরা পিছাইয়া যাইত। তাহাদের জাতের মধ্যে পণ দিয়া কন্যা আনিতে হয়, কিন্তু সে ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছিল। তাহার অবস্থা উন্নত, ছেলেটী দেখিতে শুনিতে ভাল, লেখাপড়াও জানে সুতরাং অনেক কন্যার পিতারই এদিকে দৃষ্টি ছিল অথচ তাহার থাঁই শুনিয়া কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিল না।

নিতাই একবার ছেলেটীকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর তাহার লেখাপড়া তাহার অবস্থার কথা শুনিয়া সে মাথা দুলাইল, এবং এই বিন্দুর যোগ্য পাত্র বটে। যদি বিবাহ দিতে হয় তবে বিন্দুর বিবাহ এই খানেই দেওয়া উচিত। এমন সুপাত্র সে কোথাও পাইবে না।

সে একেবারেই পাকা কথা মহিমকে দিয়া ফিরিল। পথে যাহার সহিত দেখা হইল তাহাকেই এই শুভ সমাচারটা দিতে ভুলিল না। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রাম খানায় রাষ্ট্র হইয়া গেল নিতাই বিন্দুর সঙ্গে মহিম মণ্ডলের ছেলে নরেনের বিবাহ দিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে।

সম্পর্কে দাদামহাশয় রসিক মণ্ডল তামাক টানিতে টানিতে বলিল "ছোঁড়ার নেহাৎ হাড়ন্ত-দশা ঘটেছে, নইলে এ কাজ করে? সে মহিম মণ্ডল, পিঁপড়ে ধরে তার মুখ হতে চিনির কুচি ছাড়িয়ে নেয়, বোনটার হাত পা ধরে জলে ফেলে দেওয়া।"

নিতাইয়ের সঙ্গে পথে যখন তাহার দেখা হইল, রসিক বলিল "তুই করছিস কি নিতাই মহিম মণ্ডলের ছেলের সঙ্গে নাকি বিন্দুর বিয়ে দেবার মতলব করছিস?"

সরলমন নিতাই আনন্দের স্রোতে ভাসিতেছিল, সে একেবারে রসিকের দুই পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া হাসি মুখে বলিল "আশীর্ব্বাদ কর দাদামশাই, যেন বিয়েটা হয়ে যায়, কোনও বাধা বিঘ্ন যেন না ঘটে।"

রসিক বলিল "কত চায় তারা?"

নিতাই একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল "বেশী কিছু নয়। বিন্দুর সমস্ত গায়ে একখানা করে গয়না দিতে হবে, আর ছেলেকে আংটী, ঘড়ি, চেন আর একশো-টাকা নগদ দিতে হবে।"

রসিক একেবারে হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল "বেশী না? এর চেয়ে আবার কত বেশী দিতে হয় রে? এ যে বামুন কায়েতের মত ছেলে বেচে খাওয়া, আর তুইও এতে রাজি হলি? এত দিবি কোথা থেকে বল দিকি, তোর আছে কি, তোর বাপ তোর জন্যে কয়শো বিঘে জমী, ধানের মরাই রেখে গেছে? ওই তো বার-বিঘে জমী সম্বল তোর, আর গোটা দুই আম বাগান আছে, এতে তুই কোন সাহসে এ বিয়ে দিতে চাহিস? কথা বার্ত্তা সব ঠিক করে ফেলেছিস?"

নিতাই বোবার মত মাথা চুলকাইয়া বলিল "হ্যাঁ তা সব ঠিক হয়ে গ্যাছে।"

রসিক খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল "এখন আর নড়চড় হবে না?"

নিতাই বলিল "আর নড়াও হয় না দাদামশাই।"

রসিক বলিল "কিন্তু তুই পারবি কি করে আমি যে তাই ভাবছি। আমরা বুড়ো মানুষ মাথার ওপর রয়েছি, আমাদের একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, বলতেও হয়। আজকালকার ছোঁড়াগুলো বুড়োদের মোটে গ্রাহের মধ্যে আনে না, নিজেরাই কর্ত্তা হয়ে কাজ কর্ত্তে যায়।"

নিতাই মুখখানা অন্ধকার করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল আর একটাও কথা বলিল না।

সকলেই তাহাকে সহস্রমুখে তিরস্কার করিল; অনেকে এ

বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতেও বলিল, কিন্তু নিতাইয়ের মন তাহাতে আপত্তি তুলিল। এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিলো না, সে যেমন করিয়াই হোক এ বিবাহ দিবেই।

বাস্তবিক সে বিবাহ দিল। তাহার জমী, লাঙ্গল, গরু, বাগান সব সে একে একে বিক্রয় করিল ; তাহাতে তাহার বোনের বিবাহ বেশ হইয়া গেল।

বিবাহ শেষে দারিদ্র্য মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল। এ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য নিতাই পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, সে পূর্ব্বের মত হাসিমুখে সব সহ্য করিয়া যাইতে লাগিল।

বাজিল কেবল রসিকের বুকে, আর কেহই তাহার কষ্ট অনুভব করিল না, আর কাহারও বুকে বাজিল না। রসিক ব্যথিত হৃদয়ে বলিল "নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারলি নিতাই, এমন করে ও সব দিক ঘুচালি ?"

নিতাই হাসিল, বলিল "কেন দাদামশাই ?"

রসিক রাগ করিয়া বলিল "আবার জিজ্ঞাসা করছিস কেন ? নিজের সর্ব্বস্ব হারালি, কি আর রইল তোর ? এখন যে তোকে পথে ভিক্ষা করে খেতে হবে।"

নিতাই রসিকের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল "আশীর্ব্বাদ কর দাদামশাই, তোমার আশীর্ব্বাদে আমার দেহ সুস্থ সবল থাকে, আমি খেটে খাব। আমার শরীর ভাল থাকলে, আমি কিছুতেই ভয় পাইনে।"

দিন সমানই যাইতেছিল, না হয় সুখে যাইত, এ দুঃখে যাইতেছে। তা যাক, সে যাইতেছে তো, পড়িয়া তো থাকিতেছে না।

কিন্তু একটু আঘাত যে সদানন্দ প্রাণে লাগিল সেই দিন যে দিন সে বিন্দুকে আনিতে গিয়া আনিতে পারিল না। অত্যন্ত কঠিন সুরেই মহিম মণ্ডল শুনাইয়া দিল বড় মেয়ে, নেহাৎ ছোট নয়, এখনই তাহাকে লইয়া যাইবার কি দরকার। মাথায় ছোট হইলেও বয়স তো বড় কম নয়, চৌদ্দ পনের হইল, এ সময় শ্বশুরালয়েই থাকিতে হয়। আরও সে শুনাইল যে, যদি বিন্দুর বাপ মা থাকিত তাহা হইলে পাঠানো যাইত, অথবা যদি ভাইয়ের বিবাহ হইত তাহা হইলেও পাঠাইতে একটু আপত্তি থাকিত না। কিন্তু একা ভ্রাতার আলয়ে সে এখন তাহার পুত্রবধূকে পাঠাইতে নারাজ, মান, অপমান এখন সবই তাদের, যেহেতু—তাহারই গৃহের বউ সে।

এ আঘাত নিতাইয়ের বুকে লাগিল বেশ, তাই সে আর একটী কথা বলিল না, বিন্দুর সহিত দেখা করিল না, আর সেখানে একমিনিট দেরী করিল না ; যেমন সে অতর্কিত ভাবে গিয়াছিল তেমনই অতর্কিতে সে ফিরিয়া আসিল।

হায়, কথাটা শুনিয়া দুঃখও হয় হাসিও আসে। সেই না বিন্দুকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, বিন্দুকে এত বড় করিয়াছে। বিবাহ দিতেই মাঝখানে এত বড় প্রাচীর একটা

উঠিল যে তাহার শূন্য গৃহে বিন্দু আর আসিতে পারিবে না? তাহার সেই ভাই, যে তাহাকে লালিত পালিত করিল সে আজ পর হইয়া গেল।

নিতাই জোর করিয়া আঘাতটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সত্যই তো, তাহাদের বউ, তাহারা এখন যদি না পাঠায়। বেশ তো, সে খুব সুখে আছে। তাহার যথাসর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া বোনের সে বিবাহ দিয়াছে, সেতো বোনকে সুখী করিবার জন্যই। এখানে এই ছোট গোলপাতার কুঁড়েতে আসিয়া সে কি এখন বাস করিতে পারিবে, সে কি এখন কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবে?

নিতাই তবু মনের ভুলে অন্যমনস্কে উনান ধরাইতে ধরাইতে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল

কাল সিন্ধুনীরে ভাসিয়ে ভাসিয়ে
তুমি আমি দাদা মিলেছি আসিয়ে,
আবার কালস্রোত টানে ভাসিতে ভাসিতে,
কোথা চলে যে যাব।

আত্মভোলা নিতাইয়ের চোখ ছাপাইয়া দর দর ধারে অশ্রু-ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তাহার আর উনানে আগুন দেওয়া হইল না। বহু কষ্টে হৃদয়ে যে বাঁধ সে দিয়াছিল তাহা স্রোতের মুখে ভাঙ্গিয়া গেল।

এই গানটী বিন্দু ছোটবেলায় যাত্রা শুনিতে গিয়া শিখিয়া

আসিয়াছিল, গুণ গুণ করিয়া সে আপন মনে সে এই গানটাই গাহিত। এই গানটা গাহিলেই নিতাইয়ের মনে এই দিনটীর কথাই ভাসিয়া উঠিত, সে তাহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া :দিত। আজ গাহিতে গাহিতে মনে হইয়া গেল—এই সেই দিন আসিয়াছে। বুকের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা দিয়া যে বোনটিকে সে বড় করিয়া তুলিয়াছে, কালস্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে সে কোথায় চলিয়া গেল।

ছিঃ, না, কান্না তাহাকে মোটেই মানায় না। সে সুখে আছে ; তাহার এই সুখের দিনে মনে আঁকিয়াই তো নিতাই আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে বড় ঘরে দিল, শিক্ষিতের হস্তে সমর্পণ করিল।

নিতাই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়াল হইতে ভাঙ্গা সেতারটী লইয়া তাহাতে সুর দিল। সেতারের ভাঙ্গা বুক হইতে সে তাহারই বেদনার মূর্ত্তি! নিতাই সেই ভাঙ্গা সেতারের ভাঙ্গা সুরে নিজের বুকভাঙ্গা রোদন ভরা সুর মিলাইয়া চোখের জলে ভাসিয়া গাহিতে লাগিল—

যাওয়া আসা জীবের স্বকর্ম্ম গতিকে,
কে রোধিতে পারে অনন্ত গতিকে
এই, যাওয়া আসার পথে কার বা সাথী কে
যেমন, পথিকে পথিকে পথের আলাপন!

হাহাকার এ, এ গান নয়। নিতাইয়ের বুকের মধ্যে যে

রোদনটা লুটাপুটী খাইতেছিল তাহাই গানের আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"হ্যারে নিতে, বেশ ফুর্ত্তি করে গান তো লাগিয়েছিস—এদিকে যে কি কাণ্ড হচ্ছে, তার কিছু খবর রাখিস ?" রসিক মণ্ডল বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে নিতাইকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র নিতাই তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিল ; সেতারটা পাশে কাত করিয়া রাখিয়া সে মলিন হাসিয়া বলিল "কার খবর কে রাখে দাদামশাই, ও সবে মাথা আমি ঘামাই নে।"

রসিক মণ্ডল বলিল "তা তো বরাবরই জানি। বোনটাকে আনতে গেছ্‌লি তার কি হল।"

নিতাই সব কথা খুলিয়া বলিল।

গম্ভীর মুখে রসিক বলিল দেখলি, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। চাষা বলে কি সাধে ? চাষা হয় নিজের ব্যবহারে, আর কিছুতেই না। তুই ছোঁড়া যে নিজের দোষে নিজে মরলি। কুটুম্বিতা, বন্ধুত্ব, এ করতে হয় সমানে সমানে, নইলে কিছুতেই মিলবে না। তুই গরিব, বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে যাবার তোর কি দরকার ছিল ? নিজের সর্ব্বস্ব বিক্রি করে—বস্, একদমেই সব নিশ্চিন্ত। জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব করিস নি, পূজো এল তত্ত্ব কর্‌লি নে, তারা একেবারে রুখে গেছে তাকে আর পাঠাবে না।"

নিতাই নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তা না পাঠায় না পাঠাক দাদামশাই, তার আর এসে কাজ নেই। আমার যা অবস্থা তাতে তাকে এনেই বা লাভ কি? আজ আট নয় মাস বিয়ে হয়েছে, বেশ দিন চলে যাচ্ছে। সে না থেকে আমার আরও ভালই হয়েছে, এ আমি বেশ আছি।"

বৃদ্ধ রসিক মণ্ডল তাহার দিকে চাহিল "হ্যাঁ বেশই আছিস বটে। তোকে আর কি বলব বল। তুই কি মানুষ যে কথা বুঝাই? তা যদি বুঝতিস তবে বড় ঘরে দিচ্ছি বলে বোনটাকে ধরে এমন করে জলে ফেলতিস নে। বিন্দুর দিন গুলো সেখানে যে কি ভাবে কাটে তার হিসেব রাখিস? সে সারাদিন মুখটী বুজে খেটে যায়, তবু যদি একটা ভাল কথা পায়। আবার এর পরে শুনলুম মার ধোরও আছে। এই সে দিন নাকি এমন করে মেরেছে যে পাঁচ সাত দিন বিছানায়—"

তীক্ষ্ম আর্ত্ত-কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিয়া নিতাই বলিল "তোমার পায় পড়ি দাদামশাই, তুমি চুপ কর, ও সব কথা আমার সামনে তুমি বলো না। আমি জানছি আমি তাকে ভাল ঘরে দিয়েছি, সে শিক্ষিত ছেলের হাতে পড়েছে, নিশ্চয়ই সে সুখে আছে, তুমি আমার মনের মধ্যে আর বিষ ছড়িয়ে দিয়ো না; এর পর আর সে সব কথা ভাবতে গেলে—"

অত্যন্ত যন্ত্রণার দরুণই সে একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আর সে কথা বলিতে পারিল না।

তাহার যন্ত্রণা বৃদ্ধ রসিক মণ্ডল অনুভব করিল, স্নেহের সুরে অথচ অনুযোগের রেস মিশাইয়া বলিল "তা এখন আর ভেবে কি করবি বল ? যা করেছিস ভাল করেছিস বলে তাইতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, নইলে তো আর উপায় নাই। যাক গে সে সব কথা, রান্না বান্না করেছিস ? উনোনের কাছে সব পড়ে আছে, রাঁধলি নে, খাবি নে ?"

মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া নিতাই বলিল "রাঁধব বই কি দাদামশাই ? এইবার যাব রাঁধতে।"

"যা আর দেরী করিস নে। আজ সারা দিনটা শুনলুম কিছু খাস নি। আচ্ছা মাথা পাগলা তুই, এসেই বসেছিস সেতার নিয়ে। যা, যা, আর দেরী করিস নে।"

নিতাই বলিল, "এই যে যাচ্ছি।"

রসিক চলিয়া গেল।

নিতাই ভাঙ্গা সেতারে আবার সুর দিয়া গাহিল

দাদা—কেবা কার পর কেবা আপন।

কিন্তু কিছুতেই কি সেই কথাটা হৃদয়ের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে পারা যায়, কিছুতে কি তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারা যায় ? এ চিন্তাটা তাহার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিয়া জোঁকের মতই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। নিতাই অস্থির

হইয়া পড়িল; সে যতই স্থির থাকিতে চায়, তাহার মন ততই চঞ্চল হইয়া উঠে।

সে দিন নিতাই কাজে যায় নাই। পূর্ব্ব দিন রাত্রে তাহার প্রবল জ্বর আসিয়াছিল, সে জ্বর এখনও ছাড়ে নাই, সামান্য একটু ছিল। নিতাই এখন উঠিয়া বসিয়াছে, মাথাটা এখনও অত্যন্ত ভার হইয়াছিল, নিতাই তাহাকে তত আমল দিলনা, দেওয়াল হইতে তাহার প্রিয়সঙ্গী সেতার লইয়া বাজাইতে বসিল! সকাল বেলা রসিকের কন্যা, তাহার সম্পর্কীয়া মাসী বুড়ি তাহাকে একবাটী সাগু আনিয়া দিয়া গিয়াছিল; এখন তাহা খাইয়া সে বেশ ঠাণ্ডা ভাবে বসিয়া সেতারে স্থর দিল।

সে দিন দুর্গা ষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন। আকাশ পরিষ্কার ছিল না, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছিল, বাদল বাতাসও মাঝে মাঝে ঝির ঝির করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। গাছের পাতায় জল জমিয়া ভারি হয়, বাতাসের ধাক্কা লাগিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। জলভরা সেই কালো মেঘের পানে চাহিয়া নিতাই গাহিতে লাগিল—

এবার আমার উমা এলে আর মাকে পাঠাব না,
করে করবে লোকে নিন্দে কারও কথা শুনব না।

গান গাহিতে গাহিতে তাহার মনে হইতেছিল কাল ষষ্ঠি, কাল মা বাংলায় আসিবেন, সমস্ত বাংলা আনন্দে ভরিয়া

উঠিয়াছে। তাহার হৃত আনন্দ কি ফিরিয়া আসিবে? সে আনন্দ কি তাহার জন্মের মতই বিদায় লইয়াছে?

মনে পড়িল গত বৎসরের এই দিনটীর কথা। সে দিন মাথার উপর ঝুলিতেছিল বোনের বিবাহ দিবার ভাবনা। সে পাগলের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কি করিবে সে, কেমন করিয়া বোনটীর বিবাহ দিবে। বিন্দু তাহার কাছে একখানা ভাল কাপড় চাহিয়াছিল, সে তখন আনিয়া দেয় নাই, তাহাকে তাড়া দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার পর আবার নিজেই ভারি অনুতপ্ত হইয়া সপ্তমীর দিন সকাল বেলাই তাহাকে একখানা পার্শ্বী-শাড়ি কিনিয়া আনিয়া দিল।

আজ তাহার সকল ভাবনা একেবারেই চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাণে শান্তি কই?

বাদল বাতাস হাহাকার করিয়া আসিয়া রুদ্ধ জানালায় আঘাত করিয়া গেল, মনে হইল কে যেন আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল "দাদা, দাদা,"—

দূর, এযে তাহার হৃদয়েরই ডাক। সে ডাকিবে কেন এ যে বাতাসের গর্জ্জন।

আবার—আবার সেই ডাক—"দাদা"—

আঃ কেরে, কেন জ্বালাতন করিস? আর জ্বালাস নে, নিতাইকে কেন পাগল করিতেছিস।

দরজার উপর হইতে ডাক আসিল—"দাদা" "কি কাতর

আহ্বান এ। নিতাই চক্ষু মুদিল, নাঃ, সহ্য হয় না দুর্ব্বল মস্তিষ্ক পাইয়া কল্পনা আসিয়া তাহাকে খেলাইতেছে।

"দাদা—"

"না, এ কল্পনা নয়। এই যে সামনেই দাঁড়াইয়া সে। "বিন্দু—বিন্দু"

সেতার নিতাইর হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। বিন্দু তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল "দাদা"—

"তুই এসেছিস বোন তুই এসেছিস ?"

নিতাই বোনের হাতখানা একবার শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। বিন্দু রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল "তোমার জ্বর হয়েছে দাদা ?" নিতাই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ও বেশী জ্বর নয় বিন্দু, সামান্য একটু জ্বর হয়েছে। তুই এত রোগা হয়ে গেছিস বোন, তোকে দেখে যে চিনতে পারা যাচ্ছে না।"

নিতাই স্বস্নেহে বিন্দুর ললাটোপরি পতিত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল "চোখ তোর একেবারে বসে গ্যাছে। এমন চেহারা হল কেন রে বিন্দু ?"

বিন্দু উচ্ছ্বাসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

"হ্যাঁরে কাঁদছিস কেন ?" নিতাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিন্দু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "এমন ঘরে আমায় দিয়েছ দাদা, আমার একবার খোজ খবরটী পর্য্যন্ত লও না। আছি কি মরেছি তা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা কর না।"

নিতাই খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে খোঁজ নেয় কিনা তাহা জানেন সর্ব্বান্তর্য্যামী, আর কেহ নয়।

"হাঁরে, তুই যে একলা এসেছিস? আমায় দেখতে এসেছিস? জ্বর হয়েছে এ খবর তোকে দিলে কে?"

বিন্দু উত্তর দিল 'আমি খবর না পেয়েই এসেছি দাদা, কেউ আমার সঙ্গে আসে নি।"

"কেউ আসে নি, একলা এসেছিস? সে কি কথা বিন্দু?"

বিন্দু বলিল "আমি হেঁটে চলে এসেছি দাদা, তোমার কাছে থাকব।"

আমার কাছে থাকবি, হেঁটে এসেছিস?" নিতাই বিস্ময় দমন করিতে পারিল না। বিন্দু এ সব কি কথা বলিতেছে, সে যে এসব কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বিন্দু বলিল "আমি আর সেখানে যাব না—দাদা, মেরে ফেললেও যাব না। তারা আমায় কত কথা বলে, তারা আমায় বড় মারে"—

"মারে—তোকে মারে?"

বিন্দু কাঁদিয়া বলিল "না মারে না বই কি! এই দেখ দেখি সমস্ত গায়ে দাগ। সব্বাই মারে, কেউ একটু দয়া করে না। আমি আর কত সইব, আমার প্রাণটা তো গণ্ডারের চামড়া দিয়ে মোড়া নয়। আজ আমার অনেক গাল দিয়েছে, সহ্য

করতে পারলুম না, চলে এলুম। বেশ হয়েছে, তাদের মান এবার গেছে, এখন মজা বুঝবে।"

নিতাই তাহার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল। সহসা সকল দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "না, তা হবে না, তোকে আবার সেখানে যেতে হবে।"

বিন্দু আতঙ্কে শিহরীয়া উঠিল, দুই হাত দিয়া দাদার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল "না, আমি যাব না দাদা।"

"যাব না বললেই কি হল রে?" নিতাইয়ের মুখে বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে যে শ্বশুরবাড়ী, সেখানে যেতেই হবে, না গেলে চলবেই না যে! পাগলের মত বকিসনে বিন্দু। চল, এখনি যেতে হবে। তাদের মাথায় যে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে এসেছিস, সমস্ত সমাজটার মধ্যে সে কথা ছড়াবার আগেই তোকে সেখানে নিয়ে পৌছাতে হবে; যে ঢাকা তুই খুলে দিয়েছিস, সেই ঢাকা তোকেই আবার দিতে হবে। ওঠ বিন্দু. আর বসে থাকলে চলবে না, এখনি তোকে যেতে হবে।"

বিন্দু থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল "আমার গায়ে এই দাগগুলো দেখেও আবার আমায় নিয়ে যাবে দাদা?"

"হ্যাঁ বোন, নইলে হবেই না। আমি গাড়ী ডেকে আনছি, তুই বস।"

দৃঢ়পদে নিতাই বাহির হইয়া গেল। বিন্দু কেবল কাঁদিতে লাগিল। সে যে দাদার কাছে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আসিয়াছে সে দাদা তাহার কোথায় গেল?

একটু পরেই নিতাই গাড়ী লইয়া ফিরিল। প্রাঙ্গন হইতেই ডাকিল "বিন্দু আয়, গাড়ী এসেছে।"

"দাদা"—

এবার হাল ছাড়িয়া দিয়া বিন্দু কাঁদিয়া উঠিল।

রুদ্ধকণ্ঠে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিতাই বলিল "কাঁদিস নে বোন, কি করবি? যেতে তো হবেই। তোর দাদার অবস্থা তো দেখছিস? এই ঘরে কোন ক্রমে মাথা গুঁজে থাকি। আমার মাথায় আর বোঝা চাপাসনে বিন্দু, আমায় আর জড়াসনে। আমায় এখন মুক্তি দে, আমায় আর কষ্ট দিস নে।"

সে দন্তে অধর চাপিয়া ধরিল, এত জোরে যে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল।

বিন্দু আর আপত্যি করিল না, একটা কথাও তার মুখ দিয়া বাহির হইল না, সে কম্পিত পদে কোনও ক্রমে গরুর গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া পড়িল।

নিতাই তাহার সঙ্গে রসিক মণ্ডলের ছোট ছেলে রামকে দিল। এই ছেলেটী তাহাকে তাহার শ্বশুরবাড়ী পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া আসিবে।

গো যান চলিল, ধীরে ধীরে নিতাইয়ের সকল সুখ, সকল

আনন্দ বহন করিয়া সে চলিল। যতক্ষণ দেখা যায় নিতাই দাঁড়াইয়া দেখিল, যখন আর দেখা গেল না, তখন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

তাহাকে আবার সে কোথায় পাঠাইয়া দিল ? সে যে বিপদের আশ্রয় হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল তাহারই স্নেহনীড়ে আশ্রয় লইতে, হায়; সে তাহাকে আবার সেখানে পাঠাইল ! যেমন করিয়া লোকে শৃগাল কুকুর তাড়াইয়া দেয়, তেমনি করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

ওঃ, কি করিল সে ?

বোনটী আমার—

নিতাই ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

তখনও নিতাই জ্বরে পড়িয়াছিল। তাহার দুটি চোখ প্রবল জ্বরে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, দুই চোখের কোন দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। অত্যন্ত যন্ত্রনায় সে ছটফট করিতেছিল। এমন কেহই তাহার কাছে ছিল না যে তাহার মাথায় হাত খানা রাখে, যে তাহাকে একটী স্নেহের কথা বলে। প্রাণটা এ সময় একটী স্নেহের কথা শুনিতে ব্যগ্র, কিন্তু কে আছে তাহার ? যে ছিল সে আর নাই।

আঃ, বিন্দু রে।

নিতাইয়ের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে

লাগিল। তুই আজ কোথায় আছিস বোন, একবার তোর দাদার কাছে আয়।

ছটফট করিতে করিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রসিক মণ্ডল তিন চার বায় আসিয়া দেখিয়া গেল। একটা সংবাদ নিতাইকে দিবার জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল। নিতাইয়ের অবস্থা দেখিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই।

সমস্ত দিনটা নিতাইয়ের কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, রাত্রে একবার তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কাহার একখানা কোমল হাত তাহার ললাটের উপর ন্যস্ত, বিস্মিত নিতাই ডাকিল "বিন্দু"—

"আরে হতভাগা, বিন্দু নয় রে আমি।

নিতাই ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল রসিকের কন্যা তাহার মাসী বুড়ি।

"তুমি, মাসীমা, আমি ভেবেছিলুম বিন্দু এমনি করে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিত, এমনি করে ঝুঁকে পড়ে আমায় ডাকত—"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মাসীমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল 'পোড়ারমুখী সে, তার কথা আর মনে করিস নে নিতাই। তুই ঘুমো বাবা, জর বেশ ছেড়ে এসেছে। আমি এখানে আছি, কোন ভয় নেই তোর।"

নিতাই নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল।

দিন দুই তিন কাটিয়া গেল, নিতাইয়ের আর জ্বর হয় নাই, সে পথ্য করিল।

সে দিন —কোথাও কিছু না—সে রসিক মণ্ডলের বাড়ী গিয়া হাজির হইল "দাদা, বিন্দুকে একবার দেখতে যাচ্ছি। বড় মন খারাপ হয়ে গ্যাছে, তাকে একবার দেখে আসতে পারলে মনটা ঠাণ্ডা হয়।"

রসিক মণ্ডল বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল "যাবি কোথায় রে? বিন্দু কি সেখানে আছে? তবে আর বলছি কি?

নিতাই বিস্ময়ে আত্মহারা প্রায় বলিল "সেখানে নেই? কেন আমি তো তাকে পাঠিয়ে দেছি সে দিন?"

রসিক নির্ব্বাকে শুধু মাথা দুলাইতে লাগিল।

তাহার ভাব দেখিয়া নিতাই ভয় পাইল; রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল "কি হয়েছে দাদা বিন্দুর—বিন্দু কি—"

শেষ কথাটা তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইতে পারিল না; অজানা আশঙ্কায় সে বসিয়া পড়িল।

রসিক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বিন্দুর কিছু হয় নি রে, কিন্তু এর চেয়ে হওয়াই ভাল ছিল। সে মরলেই ভাল হত' নিতাই, তা হলে পেছনে তো এমন কালো কলঙ্কের দাগ রেখে যেতে পারত না। সে আজ কয়দিন হল কোথায় চলে গেছে তা কেউ জানে না।"

অ্যাঁ, চলে গ্যাছে?"

নিতাই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাহার মুখ হইতে হঠাৎ কথা বাহির হইল না। অনেকক্ষণ পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দাদা, তবে সে আর নেই। শ্বশুর বাড়ীতে মার সহ্য করতে না পেরে সে আমার কাছে এসেছিল, আমি তাকে সেই পায়ই তাড়িয়ে দিলুম। সে জগতে আর কোথাও আশ্রয় পায় নি দাদা, তাই সে মরণের কোলে আশ্রয় খুঁজতে গেছে। মানুষ তাকে দূর করে দেছে; মরণ তাকে কোলে নিয়েছে।

দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া নিতাই হাঁফাইতে লাগিল।

রসিক তাহার হাত জোর করিয়া টানিয়া সরাইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল "আবার বলছি—তা যদি হত নিতাই—তবে তো খুবই ভাল হতো। সে কে একটী পুরুষের সঙ্গে গভীর রাত্রে ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট করে কলিকাতায় চলে গ্যাছে, এ কথা শুনতে পাওয়া গেছে। যদি মরত এর চেয়ে—আঃ, কি শান্তির কথা ছিল সেটা। সে বেঁচে নেই, মরে গেছে, এ কথাটায় বড় শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু সে বেঁচে থাকবে প্রতিদিন রাশী রাশী পাপ অর্জ্জন করবে এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না।"

নিতাইয়ের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল—আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কিছুতেই না—দাদা, কিছুতেই না! সত্যি কথা বলেছ...এর চেয়ে সে মরল না কেন? আমি চললুম যদি তাকে ফিরাতে পারি, চেষ্টা দেখব, যদি না পারি. যদি না আসতে চায়—নিজের হাতে তার গলায় দা বসিয়ে দেব।"

উন্মাদের মতই নিতাই ছুটিল, তাহার তখন বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

বিন্দু—সেই বিন্দু,—যাহাকে সে বুকের রক্ত জল করিয়া মানুষ করিয়াছে—সে এমন করিয়া চলিয়া গেল? অর্জ্জন করিতে গেল রাশী রাশী পাপ, পিছনে রাখিয়া গেল দুরপণেয় কলঙ্ক। আর কাহারও কথা না ভাবুক—দাদার কথাও কি ভাবিতে নাই?

ভগবান কি দিয়া এই নারী-হৃদয়কে গঠিয়াছেন একবার তাহা দেখিতে খুব ইচ্ছা হইল। সে উপাদান লৌহের চেয়েও শক্ত, কারণ লৌহও গলিয়া যায় কিন্তু নারী-হৃদয় গলে না।

সারা কলিকাতা সে বেড়াইতে লাগিল. যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পায় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে—তোমরা কেউ একটী স্থন্দরী মেয়েকে দেখেছ—যে একদিন সকালের ট্রেনে এখানে এসে পৌছেচে?"

লোকে হাসে, হাততালি দিয়া পাগল বলিয়া তাড়া করে, ছেলেরা গায় ধূলা দেয়, দূর হইতে ঢিল ছোড়ে, তবুও সে খুঁজিতে লাগিল। বড় রাস্তা, গলি, প্রাসাদের জানালা পথে, টাইলের ঘরের দরজায় সব জায়গায় তাহার চক্ষু ফিরিতে লাগিল কিন্তু কই; কতদিন কাটিয়া গেল, বিন্দুর সন্ধান পাওয়া গেল না, নিতাই আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িল না।

কলিকাতাতেই সে আছে, আর কোথাও সে যায় নাই এই

কথাটাই তাহার বুকের মধ্যে জাগিতেছে। তাহাকে অবশ্যই একদিন দেখিতে পাওয়া যাইবেই, নিশ্চয়ই নিতাই তাহার সন্ধান পাইবেই।

এদিকে হাত খালি হইয়া গেছে, ভিক্ষা কেহ দেয় না, বাধ্য হইয়া নিতাইকে চাকরী স্বীকার করিতে হইল।

তাহার মনিব পূর্ব্ববঙ্গের কোনও জমিদার। লোকটী কিছু ঝাঁঝাল প্রকৃতির, তাঁহার চরিত্রও যৎপরোনাস্তি খারাপ ছিল। মাঝে মাছে নৌকায় গঙ্গা বক্ষে সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া বেড়াইতেন, দমদমায় বাগান বাড়ীতে গিয়া দিনকত কাটাইয়া দিতেন।

বছর তিন চার এখানেই কাটিয়া গেল। নিতাই অবসর কালটা টো টো করিয়া ঘুরিত আশা সে কিছুতেই ছাড়িতে পারে নাই।

সেদিন বাবুর রাগান বাড়ীতে নাচ গানের মজলিস বসিয়াছে কলিকাতা হইতে নর্ত্তকী আসিয়াছে, বন্ধুবান্ধব অনেক জুটিয়াছে। বাবুরা আগেই গিয়াছিলেন, নিতাই একবাক্স লেমনেড, সোডা লইয়া পরে যখন পৌছিল, তখন নাচগান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বাক্সটা যথাস্থানে রাখিয়া বাবুর জন্য কলিকায় সুবাসিত অম্বুহি তামাক সাজিয়া আনিয়া নিতাই গড়গড়ায় বসাইতে গিয়া নিকটে নৃত্যরতা নর্ত্তকীর পানে একবার চাহিল। একেবারে পাশেই দাঁড়াইয়া সে তখন গাহিতেছিল—

যাওয়ে হাওয়ে ফিরি চাওয়ে সেঁইয়া—

নিতাইয়ের ঠক ঠক করিয়া হাত কাঁপিয়া গেল, কলিকাটা ভাঙ্গিয়া শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল, গালিচার উপর আগুণ পড়িয়া ধূয়াইতে লাগিল।

কেঁও রাসকেল—কমবকৎ—

নেশায় উন্মত্ত বাবু তাহার ঘাড় ধরিয়া শ্লিপারের কয়েকটা আঘাত পুরস্কার দিয়া এক ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

এ আঘাত নিতাইয়ের গায়ে মোটেই বাজিল না, প্রাণে তাহার যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহারই ধাক্কা সামলাইতে তাহার অনেক সময় কাটিয়া গেল।

হাঁ, এই তো সেই। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাত সেই চেহারা। এই তো বিন্দু।

উচ্ছসিত হইয়া নিতাই কাঁদিয়া উঠিল—একি কর্‌লে ভগবান, একি দেখালে আজ, এই দেখার জন্য কি সে দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেছে? সুদ্ধ পেটের জন্য বোনটীকে খুঁজিবার জন্য সে মাতালের কাছ হতে এই মার গুলো ও সহ্য করছে?

আঃ, ওই যে, গহনাগুলা ঝকমক করিতেছে, সে হাসিতেছে; বাবুরা ফুলের তোড়া, টাকা পয়সা দিতেছেন, সে হাসিয়া কুড়াইতেছে।

না, আর সহ্য হয় না। ভগবান্ ভগবান্, তোমার নাকি অষ্ট বজ্র আছে? সে কি গল্প কথা, না সত্য? যদি সত্য হয়—তবে

হে প্রভু, হে পরমপিতা, নিক্ষেপ কর তার সব ধ্বংশ কর। মহাপ্রলয় সংঘটিত হোক, এক প্রাণীও যেন বেঁচে না থাকে।

দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া টলিতে টলিতে নিতাই উঠিয়া গেল। বাবুরা ইহার পর তাহার অনেক খোঁজ করিয়াছিলেন,

গভীর-রাত্রি—বাগানবাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ। বাবুরা সব ঘুমাইয়া, ঘুমায় নাই শুধু নিতাই। একখানা তীক্ষ্ণ-ছুরি হাতে করিয়া সারা বাগানখানাময় সে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মাথায় তখন ভীষণ আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার বুক যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতেছিল। শান্তিলাভ করিবে সে তাহার বোনের রক্তে, আর কিছুতেই নয়।

বিন্দু তখন গদীর উপর পড়িয়া আরামে ঘুমাইতেছিল। দেয়ালে ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—কিন্তু খুব মৃদু ভাবে।

"বিন্দু"—বিন্দু—"

সে গর্জ্জনে বিন্দুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; ধরফড় করিয়া উঠিয়া দুইহাতে চোখ ডলিয়া ঘুমের জড়তা ছাড়াইয়া ফেলিয়া সে দেখিল যথার্থই তাহার দাদা তাহার সম্মুখে।

তাহার মুখখানা শবের মতন মলিন হইয়া গেল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পাপিনী বিন্দু বিছানায় লুটাইয়া পড়িল!

শান্ত-কণ্ঠে নিতাই বলিল "কাঁদছিস বিন্দু, ভয় পেয়েছিস, আমি তোকে ক্ষমা করেছি—আমার মাথার আগুন নিভে গেছে, আমার সেই বোনটী। আমার কাছে আশ্রয় না পেয়ে বাধ্য

হয়ে তোকে এ পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। যা হবার হয়ে গ্যাছে, এখন ওঠ ; এ সব এখানে ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে চল।"

সে কিছু বলিবে না শুনিয়া বিন্দুর সাহস ফিরিয়া আসিল, সে উঠিয়া বসিল ; জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাবে দাদা।"

দাদা উত্তর করিল "বৃন্দাবন। দুই ভাই-বোন সেখানে বেশ থাকব। ভগবানের পায়ের কাছে মহাপাপীর ও জায়গা আছে যে, সে জন্যে তোর কোন ভয় নেই। মনে করে দেখ জগাই মাধাই কি ছিল, নামের জোরে তারাও তরে গেল। আবার কাঁদিস বিন্দু? আমি তোকে উদ্ধার করতে এসেছি! ছোট বেলায় ভয় পেয়ে যেমন করে আমার হাত ধরতিস আজও তেমনি করে ধর। আমি আমার জীবন দিয়ে তোকে নিরাপদ করব, তোকে সরল পথ দেখাব। কাঁদিস না পাগলি, যা করেছিস তার হাত নাই, মুক্তির পথ যখন সামনে দেখতে পেয়েছিস, ছাড়িস নে, এই লগী ধরে বরাবর চল। দেখ—যাবি?

"দাদা।"

পাপিণী বিন্দু আছাড় খাইয়া নিতাইয়ের পায়ের কাছে পড়িল, "ধর দাদা, আজ আমার হাতখানা তেমনি করে ধর, আমায় বৃন্দাবনে নিয়ে চল। এতে বড় জ্বালা দাদা, একটু শান্তি পাচ্ছি নে।"

"আয় বোন তবে।"

গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া এক বস্ত্রে বিন্দু দাদার হাত ধরিয়া সেই নিশীথে বৃন্দাবন ধামের পথে অগ্রসর হইল। অতীতের যাহা কিছু তাহা পিছনে পড়িয়া রহিল।

সেদিন ছিল থিয়েটারে গিরীশবাবু রচিত "শাস্তি কি শস্তির" অভিনয়। সীতা সেদিন সাজিয়াছিল নির্ম্মলা।

যতবারই সে ষ্টেজে আসিতেছিল তাহার চোখ পড়িতে ছিল একটি অল্প বয়স্ক সুশ্রী যুবকের উপর। এই যুবকটী একেবারে সম্মুখেই একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার আকৃতি প্রকৃতিতে বেশ বুঝা যাইতেছিল সে সদ্বংশজাত। সে চোখে যে দৃষ্টি সীতা দেখিয়াছিল, সেরূপ দৃষ্টি সে তাহার এই দীর্ঘ জীবনে দেখে নাই।

সে চোখে যে কি ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়, তাহা শুধু অন্তরেই অনুভব করিবার। দর্শকবৃন্দ কতবারই হাততালি দিয়াছিল, কতবার তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল, কিন্তু এই যুবকটীকে সে একটিও বাক্য উচ্চারণ করিতে বা একবার হাত তুলিতে দেখে নাই; সে যেন আপনাকে হারাইয়া এই বিখ্যাত অভিনেত্রীর পানে চাহিয়াছিল! তাহার চোখে তখন সে রঙ্গালয় জাগিয়াছিল না; জাগিয়াছিল শুধু এই অভিনেত্রীর রূপখানা।

সীতা সেবার ফিরিয়া গিয়া ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল "সামনের বক্সে যে ছেলেটি বসে আছে ও কে তা জানেন?

ম্যানেজার একটু হাসিলেন, তখনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন

"জানব না কেন, ছেলেটী আমাদের হেমবাবুর দৌহিত্র পুণ্যোদয়।"

সীতা মুখখানা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া বলিন "হেমবাবুর নাতি? কই, কোনও দিনই তো একে দেখি নি।"

ম্যানেজার বলিলেন "তোমরা দেখতে পাবে কি? হেমবাবু যেরকম কড়া প্রকৃতির লোক তাতে এসব দিকে তাঁর আত্মীয় ছেলেছোকরা বড় একটা ঘেঁসতে পারে না। হতে পারে তাঁর চরিত্র খারাপ কিন্তু তা বলে তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী এই নাতিটীর একটু অনিষ্ট তিনি সইতে পারবেন না। তোমাদের চোখের সামনে স্থন্দর এই ছেলেটীকে রাখা তার মোটেই ইচ্ছা নয় বলেই একে এতকাল এর কাকার কাছে বাঁকিপুরে রেখেছিলেন। তাঁর থিয়েটার, তাঁকে হরদম থিয়েটারে আসতে যেতে হয়, তোমাদের সঙ্গে সংস্রব খুবই বেশী, তা বলে তিনি চান না তাঁর নাতি এই সূত্রে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়। কিছু মনে করো না সীতা তোমাদের যে বিশ্বাস করতে কেউই পারে না, হেমবাবু নিজকে দিয়ে দেখেচেন বলেই এত সতর্ক হয়েছেন! অভিনেত্রীর আয়ত চোখ দুইটা একথায় জ্বলিয়া উঠিল, সে শুধু বলিল "বটে?" কথাটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মত বাহির হইল।

ম্যানেজার বলিলেন "তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া অন্যায়। সংসারে সকল লোকেরই এই মত, এই কথা। তোমাদের শুধু তিনিই যে ঘৃণা করেন তা নয়, সংসারে সবাই ঘৃণা করে।"

ঘৃণা কথাটা ধক করিয়া সীতার বক্ষে বাজিল। এমন স্পষ্ট কথা কোনও দিনই সে শুনিতে পায় নাই। পাংশু মুখে সে বলিল "আমি একাজ ছেড়ে দেব। আজকার দিনটা যখন কথা দিয়েছি অবশ্যই অভিনয় করে যাব, কিন্তু কাল হতে আমি আর এ থিয়েটারে কাজ করতে আসব না, যেখানে এত ঘৃণা বহন করে আসতে হয়—ছিঃ।"

ম্যানেজার বলিলেন, এটা তোমার রাগের কথা সীতা। এ থিয়েটারে কাজ না কর অন্য থিয়েটারে কাজ নেবে। সেখানে না পোষায়, তুমি অন্য কিছু করবে। যাই কর নিজের ব্যবসা তোমার যখন থাকবেই তখন এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া অন্যায়।"

"সে দেখা যাবে"—

ইহার পর সীতা আবার যখন ষ্টেজে নামিল তখন তাহার মধ্যে সে স্ফূর্তির বিকাশ দেখা গেল না, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বাভাবতঃ সে হাসির রেখাটুকু বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

বিস্তীর্ণ সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে সীতা একা বসিয়া হারমোনিয়মে স্বর দিতেছিল। আজ তাহার বেশভূষা সাধারণ। তাহার গায়ে একটা সাদা সেমিজ, একখানি সরু কালাফিতা সাড়ী, হাতে গাছকতক চুড়ি, কাণে দুটি ছোট ইয়ারিং, গলায় সরু হার।

থিয়েটারের বেশভূষা চেয়ে তাহার ঘরের সাধারণ বেশই আরও ভাল দেখায়।

বেহারা আসিয়া খবর দিল একটী বাবু দেখা করতে চান।

সীতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "আবি নেহি মুলাকাৎ হোগা, যানে কহো।"

বেহারা জানাইল, বাবুকে সে বলিয়াছিল আর সীতা কাহারও সহিত দেখা করিবে না; তথাপি সে যাইতে চায় না, বলিতেছে একটীবার মাত্র দেখা করিয়াই সে চলিয়া যাইবে।

সীতা একটু ভাবিয়া বলিল "আনে দেও।"

বেহারা চলিয়া গেল, সীতা নিজের মনে হারমোনিয়মে স্থর দিতে লাগিল।

দ্বার হইতে বেহারা ডাকিল "মাজি, বাবু আয়া।"

মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সীতা আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সেই যুবকটী দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া। যেন কত কালের হারা জিনিষ সে খুঁজিয়া পাইয়াছে এমনই তাহার মুখ চোখের ভাবখানা, আনন্দ সে যেন বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, কতকটা ছুটিয়া আসিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

মাত্র গুম্ফের একটু রেখা উঠিয়াছে, বয়স তাহার বোধ হয় উনিশ কুড়ি। অপরিণত যুবক এখনও শেষ ফল ধারণা করিতে পারে নাই, এই রূপসী-নারীর পিছনে যে কে দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটী

হানিতেছে, তাহা এখনও চাহিয়া দেখে নাই। অপরিণামদর্শী বুঝিতে শেখে নাই কি হইবে ইহার পরে। সে মুগ্ধ হইয়াছে, সে সব ভুলিয়া তাই এই নরকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আসিয়াছে।

বেদনার রেখা সীতার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। সেই কি এ সহজ জ্ঞান পাইয়াছিল, সেও কি জানিয়াছিল কি ভীষণ অভিশপ্ত জীবন তাহার? সে মাথায় বিজয় মুকুট পরিয়াছে ভাবিয়া গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়াছিল, কত বক্ষকে সে নিমেষে জয় করিয়াছিল ভাবিয়া আনন্দে ভাসিয়াছিল। কাল থিয়েটার শেষে বাড়ী আসিয়া তাহার এই চব্বিশ বর্ষের দীর্ঘ জীবনখানার কথা আগা গোড়া আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছে, সব ভুল। সে বিজয়ের পথ ধরিয়া চলে নাই, জীবনব্যাপী পরাজিতা হইয়াই আসিয়াছে। আপনার নারীত্বকে পদদলিত করিয়া, পুরুষের বিলাস পুত্তলী রূপে পরিগণিত হইয়া, অর্থ বিনিময়ে দেহ বিক্রয় করিয়া— হায়রে, কেমন করিয়া সে ভাবিয়াছে সে জয়ী হইয়াছে? তাহার নারীত্ব নাই, তাহার আত্মমর্য্যাদা নাই, পুরুষ তাহাকে দেখিবে কোন চোখে? যাহা থাকিলে জয়ী হওয়া যায়—কই, তাহার নাই তো! সে যে স্পর্শমণি, তাহা স্পর্শে সবই যে সোণা হইয়া যায়, কামনা লোলুপ পুরুষও যে তাহার স্পর্শে নিস্পৃহ হইয়া পড়ে, হায়, কই তাহার সে রত্ন? জ্ঞানের প্রারম্ভে সে তাহা হারাইয়াছে।

তবু—তবু হে অপরিণামদর্শী যুবা, এই পতিতা যদি তোমাকে

তাহার নরকের দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিতে পারে, সে তাহার জীবনে যথার্থ একটা সৎকাজ হইবে বলিয়া মনে করিবে।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেশ সহজ স্বরেই সে বলিল "এস, এই চেয়ারখানায় বস।" বেহারার পানে তাকাইয়া চোখ পাকাইয়া বলিল "আউর বাবু ঘুসনে মৎ দেও, সমঝায়া হামরা বাৎ ?"

"বহুৎ সমঝায়া মায়ি।" সে চলিয়া গেল।

সম্মুখের চেয়ারখানা টানিয়া তফাতে লইয়া গিয়া তাহাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সীতা জিজ্ঞাসা করিল "তারপর, এখানে কি মনে করে বন্ধু ?"

পুণ্যোদয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ-হইয়া গিয়াছিল, সে আকুল চোখে সেই মুখখানা দেখিতেছিল, কি রূপ, কি সুন্দর মুখ, দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটে না। তরুণ যৌবন যাহা প্রার্থনা করিতেছিল তাহা এই।

সীতা আবার জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাও ? শুধু আমার মুখপানে এমনি করে আত্মহারা ভাবে তাকিয়ে থাকতে এসেছ কি ?"

তাহার কণ্ঠে বেদনা মিশ্রিত ঘৃণার ভাবটাই ফুটিতেছিল।

যুবক মাথা নাড়িল।

সীতা বলিল তবে কি চাও আমায় পেতে ?"

অস্ফুট-কণ্ঠে পুণ্যোদয় উত্তর দিল "হ্যাঁ, তাই চাই।"

সীতা একটু হাসিল "আমায় পেতে চাও ? নির্ব্বোধ যুবক,

আমায় পাওয়া রিক্ত-হস্তে হয় না, তা জানো? আমি ভালবাসা, প্রেম, প্রণয় এ সবের ধার ধারি নে—কারণ—

“মাপ কর, আমি কিছু দিতে পারব না, আমি তোমায় ভালবাসি, শুধু এই অকৃত্রিম ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার এ ভালবাসা ফিরিয়ে দিয়ো না তোমার পায়ে পড়ি—

সত্যই সে তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।”

সীতা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, কঠোর-স্বরে বলিল “এ ভালবাসার অধিকার স্ত্রী কাছে সাজে বন্ধু, অভিনেত্রীর কাছে সাজে না। অভিনেত্রী চেনে রূপ আর রুপেয়া। রূপ আছে, রূপেয়া লে আও, তবে আমায় পাবে, নচেৎ পাবে না।”

এই মিথ্যার অভিনয় করিতে তাহার যথার্থই কষ্ট হইতেছিল।

পুণ্যোদয় তাহার মুখের পানে হতাশ নেত্রে নিস্তব্ধ খানিক চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল আচ্ছা, যদি আমি টাকা আনতে পারি তুমি একেবারে চিরজন্মের মতই আমার হবে তো, কখনও আমায় ছাড়বে না?

সীতা বলিল “থাকব, কখনও তোমায় ছাড়ব না, কিন্তু কি করে টাকা আনবে তুমি? তোমার দাদামশাইয়ের সিন্দুক হতে অথবা তোমার মায়ের যা কিছু আছে চুরি করে এনে আমায় দেবে তো?”

তাহার মুখে কি একটা জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এইবার তাহার দিকে পুণ্যোদয়ের চোখ পড়িল, এইবার তাহার কণ্ঠস্বরে সে শুধু উগ্রতা শুধু ছলনা নাই তাহাও সে লক্ষ্য করিল। পুণ্যোদয় থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর বলিল "আমি যেমন করেই পারি তোমায় এনে দেব। মোট কথা তোমায় পেতে চাই, একেবারে পেতে চাই।"

"পেতে চাও, একেবারেই পেতে চাও? বেশ কথা বলেছ তুমি, আমায় পাবার জন্যে, আমার বাসনা মিটানোর জন্যে তুমি সব করতে প্রস্তুত। প্রথম যখন এসেছিলে তখন প্রাণের টানে এসেছিলে, ভাবনি ভালবাসার চেয়ে বেশী হচ্ছে অর্থ। জাননি বন্ধু এখানে নিক্তি ধরে সব জিনিসের ওজন হয়, কিছু বাদ যায় না।

সীতা একটু থামিল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া হাতখানা পুণ্যোদয়ের স্কন্ধে রাখিয়া কোমল-স্বরে বলিল "কিন্তু কিসের লোভে তুমি এগিয়েছ তা কি একবার ভেবে দেখছ? কি পাবার জন্যে যে তুমি এই হেয় চৌর্য্যবৃত্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করছ তা জানছ? এই তুচ্ছ দেহটা, মরে গেলেই যার সব শেষ, দেহের অবশিষ্ট যার শুধু ছাই, একে পাবার জন্যে এ কি বাসনা তোমার? শেষ দিন কখনও কখনও ভেবেছ কি বন্ধু? সব কাজেরই একটা শেষ আছে, তোমার এ সব কাজেরও কি শেষ হবে না ভাবছ? একবার চাও, ভাল করে চেয়ে দেখ আমার পানে—"

সে মুখখানা পুণ্যোদয়ের মুখের সামনে নত করিল "দেখ, এ মুখে কি আছে, এ দেহে কি আছে? আমায় স্পর্শ কর, দেখ এতে কিছু নেই, সবার যেমন আমারও তেমনি। ভ্রান্ত তুমি, কিসের মোহে মজেছ বল?"

পুণ্যোদয় বিহ্বলের মত তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার আকাঙ্ক্ষিতা তাহার বড় কাছে, তবু তাহার সাহস হইল না সে দেহকে স্পর্শ করে।

বিষণ্ণ-স্বরে সীতা বলিল "পারছ না, স্পর্শ করতে পারলে না আমাকে? অথচ আমার জন্যেই তো ইহকাল পরকাল হারাতে বসেছিলে?"

রুদ্ধ-কণ্ঠে পুণ্যোদয় বলিল "আমি তোমায় ভালবাসি তাই তোমায় স্পর্শ করতে পারছি নে সীতা।"

সীতার চোখে দুইবিন্দু জল ছল ছল করিতে লাগিল, তাহার হাত দুইখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল বুঝলুম—যথার্থই ভালবেসেছ। তোমার এই ভালবাসা যথার্থ আমার বুকে একটা প্রলয়ের তুফান এনে ফেলেছে। তোমার ভালবাসা আমায় উঁচুতে তুলে দেবে, আমায় আর নামাবে না, আমার পথ আর কণ্টকাকীর্ণ করে তুলবে না। যদি যথার্থ ই এই পাপিনীকে ভালবেসে থাক বন্ধু তবে ফিরে যাও; আমায় যে উদ্ধার করতে পেরেছ এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার কাজকে ঘৃণা কর, আমায় ভালবেসো, কিন্তু কাছে এস না, স্পর্শ

করো না ; তাহলে পাপ তোমায় ছুঁয়ে ফেলবে। যাও—ফিরে ঘরে যাও। আবার দেখা হবে, তখন দেখতে পাবে তোমার এই যথার্থ ভালবাসাই আমায় নূতন পথের সন্ধান বলে দেছে।

পুণ্যোদয় কথা কহিতে পারিল না, চোখের অশ্রু উপচাইয়া অজ্ঞাত সীতার হাতে পড়িয়া গেল, সে সীতার পানে বিহ্বল নয়নে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সীতার গৃহের দ্বার সেদিন হইতে চিরতরে সাধারণের পক্ষে রুদ্ধ হইয়া গেল।

বহুকাল পরে আবার দেখা হইল।

পুণ্যোদয় সন্ন্যাসিনীকে চিনিতে পারে নাই, সে খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সরিয়া যাইতেছিল, সন্ন্যাসিনী একটু হাসিল মাত্র ! আমায় চিনিতে পারছ না তুমি—?

বিস্মিত পুণ্যোদয় বলিল না, "কে তুমি ?"

সন্ন্যাসিনী আবার হাসিল, নত হইয়া বলিল, "তুমি আমার সত্যপথের গুরু, পায়ের ধূলা দাও আমি ধন্য হয়ে যাই, গুরুর পায়ের ধূলা না নিলে কিছু হয় না। দীক্ষা দিয়ে গেছলে, কিন্তু পায়ের ধূলা দাও নি।"

পুণ্যোদয় সরিয়া যাইবার আগেই সে পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল—"আমায় চিনতে পারছ না, আমি সীতা ?"

সীতা, সীতা—আমার সীতা—"

আনন্দে অস্ফুট চীৎকার করিয়া পুণ্যোদয় অগ্রসর হইল!

সীতা সরিয়া গেল, বলিল "স্পর্শ করো না যদি প্রকৃত ভালবেসে থাকো তবে কখনই আমায় স্পর্শ করতে পারবে না। প্রকৃত ভালবাসায় কামনা বাসনা থাকে না, অতৃপ্তি থাকেনা কারণ ভালবাসা পেতে চায় না দিতে চায়। দেওয়ার মধ্যে সে নিজের সার্থকতা অনুভব করে, সে ধন্য হয়ে যায়। আমায় যদি ভালবেসে থাকো তবে এগিয়ো না, যেখানে আছ সেখানে দাঁড়াও।"

পুণ্যোদয় দাঁড়াইল উচ্ছ্বলনেত্রে ডাকিল "সীতা—"

সীতা রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল অভিনেত্রীকে আজও ভুলতে পার নি দেখছি। অভিনেত্রী যে মরে গ্যাছে পুণ্য, আজ আছি আমি, সন্ন্যাসিনী। আমার সকল বাসনা কামনার তৃপ্তি হয়ে গেছে; বুকে যে আগুন জ্বলছিল তাতে আমার ভোগ বিলাস সব পুড়িয়ে ফেলেছি। আমার যে যজ্ঞ আমি আবহমান করেছিলুম, তার হোতা হলে তুমি, তাই বিনাড়ম্বরে নির্ব্বিবাদে সে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে গ্যাছে। আমার বন্ধু, আমার প্রিয়, আমার গুরু, আজ আমার সব হয়ে গ্যাছ। তুমি ভালবেসে বিশ্ব জয় করেছ।"

সীতার মুখখানা যেন জ্বলিতেছিল, পুণ্যোদয় আনন্দবিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ছেলেটাই অবশেষে হল কাল।

হ্যাঁ, পায়ের বেড়ি ছাড়া আর কি? চলতে গেলে পা আর স্বচ্ছন্দে ফেলবার যো নেই, পদে পদে বেঁধে যায়, ঝন্ ঝনানী শব্দে তাকাতে হয়।

বেশ ছিল সিধু, দিব্য আরামে দিন কাটিয়ে দিত। একটা দিন মূহূর্ত্তের জন্যও সে বাঁধন অনুভব করে নি। বিয়ে সে অনেক কাল আগেই করেছিল, পত্নী সুধাও কিন্তু তাকে কোন দিন ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারে নি?

স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন ধারণাই সে কোনদিন করে নি। স্ত্রী চিরকালই স্ত্রী, রাঁধবে বাড়বে, সংসারের কাজ কর্ম্ম করবে। এইমাত্র বাইরের কাজ সেরে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন বাড়ী ফিরবে, স্ত্রী তখন ছুটে এসে পা ধুইয়ে দেবে, বাতাস করবে ইত্যাদি।

স্ত্রীর জন্যে সে কোন দিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হয়, তা সে কোনদিন মনেও করে নি। স্ত্রীর আবশ্যকতা ছিল ঘরের জন্য, সেবার জন্য, প্রাণের জন্য নয়।

সেই স্ত্রীই যখন দুই বছরের ছেলে নরেশকে রেখে মারা গেল, তখনই সিধুর মনে হল—সে কি ছিল, কতখানি জুড়ে ছিল। স্ত্রীর কর্ত্তব্য সেরে সে তো বেশ চলে গেল। কিন্তু

এ কি দায়িত্ব চাপিয়ে গেল সিধুর ঘাড়ে, এই ছেলে সামলাতে যে কে যায় ?

শিশু ছেলেকে নিয়মিত খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, ভুলোনো—একি তার কাজ ? ছেলের দুই বছর বয়সের মধ্যে সে তো ছেলের দিকে মনও দেয় নি। খেলতে খেলতে কখনও কাছে এসে পড়লে, একবার মাত্র তাকাতে গিয়ে সে হয় তো তন্ময় হয়ে এক ঘণ্টাও কাটিয়ে দিয়েছে,—তবু স্বপ্নেও জাগেনি, যার খেলাটাই দেখতে সুন্দর মাত্র, তার ভার কোন দিন এমন ভাবে তার ঘাড়ে এসে পড়বে।

সে কি এর আগে কোন দিন ছেলেকে কোলে নিয়েছে, খাইয়েছে, ঘুম পাড়িয়েছে ? কেমন করে খেলা দিতে হয়, কাঁদলে ভুলাতে হয়, তাই তো সে জানে না।

ছেলেটাকে নিয়ে সে যখন অতি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে তার বন্ধুবান্ধবেরা তাকে আবার বিয়ে করবার উপদেশ দিলে।

"আবার বিয়ে—

সিধু মুখখানা অতিমাত্রায় বিকৃত করে তুল্‌লে। একটা বিয়েতেই রক্ষা ছিল না, তার জের এখনও চলছে—আবার বিয়ে ? দরকার নেই,—ছেলেটার বয়স দুই বছর,—আর গোটা তিনেক বছর কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই সে মানুষ হয়ে যাবে।

বন্ধু শান্ত বললে "ওই ছেলেকে নিয়ে কাজ-কর্ম্ম করবে কি করে সিধু?

সিধু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "দেখি, ওকে যদি কারও কাছে দিতে পারি।"

কিন্তু ছেলেও যেন ছিনে জোঁক;—এমন করে সিধুকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে যে, কাউকে দেওয়া চললো না। শান্ত জোর করে ছাড়াতে গেল, সিধু, সন্ত্রস্ত হয়ে বলে' উঠলো—"থাক—থাক দু'দিন যাক, তারপরে যা হয় তাই হবে।" শান্ত বিকৃত মুখে জানালে—"ব্যবসা চলবে কি করে? ছেলে নিয়ে বসে থাকলে তোমার চলবে না সিধু।"

চলবে না তা সিধুও জানে, কিন্তু ওই দু'খানা কচি হাতের বাঁধন সে খসাবে কি করে? স্ত্রীর উপরই যত রাগ পড়ল—হতভাগী মরবার সময়েও শত্রুতা করে গেল। যাবি যা, এটাকে রেখে যাওয়ার কি দরকার ছিল?

শান্ত এসে বলে—"এ দিকে হাঁড়ী যে শিকের উঠল, কাজে বেরুবে চল।

শূন্য দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে সিধু বলে, "নাঃ, ও সব কাজ আর করব না শান্ত।"

শান্ত হেসে উঠলো, ছুরির ধারালো ফলার মত তীক্ষ্ণ তার

হাসি, বুকের মধ্যে কেটে বসে। সিধু নিষ্পলকে কেবল তার পানে তাকিয়ে রইল।

শান্ত তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "ও সব ধর্ম্ম-টর্ম্ম আমাদের সাজবে না হে সিধু, অনেক দিন হাত পা গুটীয়ে বসে আছি—তোমার জন্য আমিও কাজে হাত দিতে পারছি নে। তোমার না হয় একটী ছেলে, যেমন তেমন করেও দিন চালাতে পারবে, আমার তো তা নয়। আট দশটী পোষ্যকে খাওয়াতে হবে—পাই কোথায় বল তো ?"

সিধু বললে, "কিন্তু আমার মনে হয় ও সব চুরি ডাকাতির কাজ আর না করাই ভাল। লাভই বা কি হয়েছে বল দেখি ? এতদিন এত যে চুরি ডাকাতি করেছি, তবু আমাদের কষ্ট তো কোনদিনই যায় নি। তারপর সব সময় ভয়—কখন ধরা পড়ব। আমি বলছি, এ কাজ করার চেয়ে আমাদের কোন চাকরী করাও ভাল।

শান্ত আর হাসি রাখতে পারে না—"চাকরী আমাদের দিচ্ছে কে—চাকরীর বাজারে আগুন লেগেছে বলেই না এই পাপ কাজ করা !"

সিধু সোজা উত্তর দিলে, "ভিক্ষে করে খাব সেও ভাল।"

শান্ত গম্ভীর হয়ে বললে, "ভিক্ষে দেবে কে ?" দেশের যে অবস্থা কেউ খেতে পাচ্ছে না।"

সিধু উত্তর দিলে, "দেখা যাক, কয়দিন জোটে।"

শান্ত রাগ করে চলে গেল।

সিধু ঘুমন্ত ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ভাবছিল—আর সে চুরি ডাকাতি করবে না। চাকরী না জোটে, ভিক্ষা করেও সে দিন চালাবে। ভগবানের রাজ্যে কেউ নাকি উপবাসী থাকে না—এ কথায় প্রমাণ এইবার পাওয়া যাবে।

দিনরাত সশঙ্কভাবে থাকা আর ভাল লাগে না। আজ যদি সে ধরা পড়ে—খোকার উপায় ? কে তাকে দেখবে-শুনবে ?

সিধু শিউরে উঠলো।

এই সেই সিধু—লোকের সর্ব্বনাশ করতেই যার এক মাত্র আনন্দ,—কত লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে, কত লোককে কাঁদিয়েছে। পুলিশকে সে ভয় করে নি, দশ বারো বার জেলে গিয়ে জেলকে সে ঘরের মতন করেছে। আজ সে ভাবে—সে ভয় করে, সে জানে আর তার জেলে যাওয়া চলবে না।

দুর্ভাগা দেশ, এখানে ভিক্ষাই বা মেলে কই, ভিক্ষাদাতারই যে অনাটন !

সিধু সারাদিন ভিক্ষার প্রত্যাশায়, পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে—ভিক্ষা পাওয়াই মুস্কিল।

কত কষ্টে সে লোভ দমন করে, তা সেই জানে। সে দিনে স্বমুখ দিয়ে গেল একটী ছোট মেয়ে বছর পাঁচ ছয় বয়স হবে। সম্পূর্ণ একা—গলায় তার সোণার হার। সিধুর সারা চিত্ত উন্মুখ

হয়ে উঠে,—মনে হয় ছেলের কথা। বেচারার একটা জামা নেই, এক পোয়া দুধ তাকে সিধু দিতে পারে না। ওই হারটা নিতে পারলে বিক্রি করে বেশ কিছুদিন কেটে যায়।

দুই পা এগিয়ে গিয়ে সে পেছিয়ে এলো—সে করতে যাচ্ছে কি? ছেলের দিকে তাকিয়ে যে কাজ ছাড়তে প্রতিজ্ঞা করেছে—আবার তাই-ই করবে? ভগবান রক্ষা কর সিধুকে, রক্ষা কর।

সে দিন একজন লোক ধমক দিয়ে বলে গেল, "এত বড় হাতীর মত শরীর ভিক্ষা করতে লজ্জা করে না? চাকরী না জোটে, জন মজুরের কাজ করে খাওনা।"

এ যেন একটা নূতন পথ পাওয়া গেল। চাকরী পাওয়া যাবে না, কিন্তু জন-মজুরের কাজ তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

প্রথম দু' চার দিন তার যা কষ্ট হল তা অবর্ণনীয়। সারাদিন পরে সিধু শুয়ে পড়ত, আর উঠতে পারত না। খোকার জন্য আবার উঠতে হতো—তাকে দেখবে কে!

সেদিন সে বইছে একটা কারখানার চুণের বস্তা, শাদা চুণের গুঁড়ায় মাথা হতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর ঢেকে গেছে—সেই সময়ে দৃষ্টি পড়ল পথের পরে একখানা ট্যাক্সিতে বসে শান্ত হাস্‌ছে, অতি তীব্র সেই ছুরির মত ধারালো!

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে মাথা নুইয়ে পড়ে, চোখ ফেটে

জল আসে। জোর করে সিধু মনে শক্তি আন্‌তে চায়—সে যা করেছে এ সৎপথে থাকা। চুরি ডাকাতি করে সেই পয়সায় বাবুয়ানা সেও করেছে, সে প্রবৃত্তি তার মধ্যে আর যেন না আসে।

বাড়ী ফিরে সে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে।

বেশ ছিল সে, পায়ের বাঁধন ছিল না,—ভগবান এ বাঁধন কেন দিলেন, কে চেয়েছিল?

ছেলেটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল "বাবা বাঁশী নেব, একটা বাঁশী ওদের মত—"

সাপের মত ক্রূর দৃষ্টিতে সিধু খোকার পানে চাইলে। সে দৃষ্টির সামনে ছেলেটা গুটীয়ে এতটুকু হয়ে গেল, নির্ব্বাকে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

করুণা? না, সিধু এতটুকু করুণা করবে না। ওই ছেলেটার গলা টিপে মারতে কতক্ষণ? তার সবল হাতের একটী পেষণেই ও সাবাড় হয়ে যাবে—

সিধু শিউরে ওঠে, এ সব সে ভাবছে কি? না না, সে মুক্ত হতে চায় না, এই বন্দীর জীবনই তার ভাল, সে এমনি করেই দিন কাটাবে!

চোখের ওপর শান্তর বাবুয়ানা চলে—আর সিধুর দারুণ অভাবে কষ্ট পায়।

সেদিন খোকা এসে বায়না ধরেছে পাশের বাড়ীর ছেলের মত তার একটা জামা চাই-ই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল—জামার দাম চার-টাকা। গরীব সিধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। অতীতের কথা মনে পড়ে—অমন কত চার-টাকা সে উড়িয়ে দিয়েছে। আজও কি সে পারে না আন্‌তে ? কিন্তু সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে অসৎ উপায়ে সে টাকা আনবে না।

অনেক কষ্টে সে সংযম অভ্যাস করছিল, এই সংযম গেল একদিন ভেঙ্গে।

নিজের চোখে সে দেখতে পেলে তার ছেলে পাশের ধনীর ছেলের সঙ্গে খেলতে গিয়ে কি নির্যাতনই না সইলে! ওইটুকু ছেলে—তবু তার কি সহ্য-শক্তি। গলাধাক্কা খেয়েও কাঁদ্‌লে না।

একটা জামা সে হাতে করে আনছিল, তাদেরই বাড়ীর ছেলের জামা, এই জামার উপরই তার লোভ ছিল দুর্ব্বার, তাই বাপকে দেখাতে আনছিল। ওদের কাছে আগে সে চেয়েছিল—ওরা দেয়নি। দেখাতে ঝোঁকের বশে সে নিজেই আনতে গিয়ে ধরা পড়ে চোরের অপমানই সইলে।

ওদের তিরস্কারের মধ্যে একটা কথা এসে সিধুর বুকে বাজলো—"চোরের ছেলে তো—ও যে চোরই হবে সে জানা কথা। ওর বাপ এখন হতে ওকে শিক্ষা দিচ্ছে।"

"চোরের ছেলে—"

সিধুর চোখ ছুটো সাপের মত ক্রুর ও জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল। সে সৎ পথে ফিরেছে, সৎ কাজ করছে, কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে ছেলেকে জামা দেওয়ার—ভাল খাবার খেতে দেওয়ার ক্ষমতা নাই—সে কথাটা কেউ শুনলেও না—কেউ বললেও না? সে সাধু ভাবে কাল কাটালেও তার সেই অখ্যাতি রয়ে গেল—সে চোর?

কি দরকার এই সাধুতায়? মনকে শান্তি দেওয়া—কিন্তু তাতেই বা কি দরকার? যে ছেলের জন্যে সে এত করছে, সেই ছেলেকেই যদি অপযশের অংশ নিতে হল, কি দরকার তার এই আবরণে? তার স্বরূপ প্রকাশ হোক, সে যা তাই হোক।

সিধু ছুটে গেল শান্তর কাছে।

তার হাত ছু'খানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে রুদ্ধ-কণ্ঠে সে বললে, "আমি ভুল বুঝেছিলুম, চোর সৎভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করতে চাইলেও সমাজ তাকে সে সুযোগ দেবে না, চিরদিন তাকে উপেক্ষাই করবে। চোর চিরদিন চোর হয়েই থাকে, আমি যা' তাই হব!"

শান্তর চোখ ছুটি উজ্জল হয়ে উঠলো, তার হারা সঙ্গীকে সে আবার ফিরে পেলে চলার পথে।

অভাব আর রইল না, খোলার ঘর ছেড়ে দিয়ে সিধু উঠল ভালো কোঠা বাড়ীতে। খোকার জন্যে ঝি চাকর নিযুক্ত হল—সিধু দিনের পর দিন পিছল পথে দ্রুত নেমে যেতে লাগল।

কিন্তু দৈবের গতি—

হঠাৎই একদিন সে ধরা পড়ে গেল, ট্রেণে ডাকাতি, খুন করার চেষ্টা। শান্ত পালিয়েছিল, সিধু পালাতে পারেনি।

আশ্চার্য্য, যে মেয়েটীর বুকে সে ছুরি চালিয়েছিল, প্রথমে তার মুখ ভাল করে দেখতে পায়নি, পরে দেখতে পেলে, সে তার সেই স্ত্রীর মুখ—ঠিক সেই চোক।

সিধু আড়ষ্ট হয়ে তার পানে চেয়েছিল—সেই অবসরে সে গ্রেপ্তার হল।

সেই মুহূর্ত্তে মনে পড়ল খোকার কথা, সিধু ছট্‌ফট্ করতে লাগল—কিন্তু উপায় আর নাই, সে নিজেই বন্দী হয়েছে।

সমস্ত দোষ তারই মাথায় নির্ব্বিচারে চাপান হল, সেও অস্বীকার করলে না—বিবেকের দংশনে সে অধীর হয়ে পড়েছিল। কেন সে ছেড়ে দিয়ে আবার এ পথে এল, কেন সে এ কাজ করলে?

রাত্রে ঘুমিয়ে সে শান্তি পায় না—চম্‌কে ওঠে। মনে হয় পাশে কে শুয়ে আছে, তার ছোট তুল্‌তুলে হাতখানা যেন তার গলাটাকে জড়িয়ে রেখেছে। ঘুম ভেঙ্গে সে হাত বাড়িয়ে পাশের দিকে খোঁজে—বুকখানা সেখানে আছে কি?

সেদিন হঠাৎ সে ধড়ফড় করে উঠে বসে ছিল, মনে হয়েছিল খোকা কাঁদছে—তুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সে ডাক্‌ছে—"বাবা গো বাবা—"

আজ তার কেউ নেই—কেউ নেই কোলে তুলে নিতে, তাকে আদর করতে। অপদার্থ শৃগাল কুকুরের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তারপর—তারপর যে কি হবে তা সিধু ভাবতেও পারে না, তুই হাতে কেবল মাথার চুল ধরে টানে।

দীর্ঘকালের জন্য দ্বীপান্তর।

সিধুর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী কালো হয়ে এলো সিধু জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ল একটি শব্দও তার মুখে ফুটিল না।

যখন জ্ঞান ফিরিল তখন সে জেলে।

হাহাকার করে সিধু জেলারের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল—"সাহেব, আমার ছেলে—এতটুকু একটী ছেলে আছে। তাকে দেখতে কেউ নেই, সে না খেয়ে মারা যাবে।"

আজ সে বুঝছিল, কিন্তু উপায় আর নাই। অত্যন্ত ক্ষোভে, মনঃকষ্টে সে নিজেই নিজের হাতখানা এমন জোড়ে কামড়ালে যে, রক্ত ঝরতে লাগল।

যদি সে ছেলেটার গলা টিপে একেবারে শেষ করে দিয়ে আসতে পারত, তাকে আজ পেছন পানে চাইতে হোত না, মনে তবু সান্ত্বনা থাকে যাকে সে সব চেয়ে বেশী ভালবাসত, তার

শেষ করেছে সে নিজেই। কেন সে তাই করে এল না, কেন সে খোকাকে একা ছেড়ে দিয়ে এল।

দ্বীপান্তরে যাওয়ার আগের দিন শান্ত এল তার সঙ্গে দেখা করতে। সিধু যে তার নাম করেনি, এর জন্য শান্ত তার কাছে ভারি কৃতজ্ঞ।

সজল চোখে সে বললে "কিছু ভয় করো না সিধু, তোমার ছেলের ভার আমার হাতে, আমি তাকে মানুষ করে তুলব। যদি তুমি কোন দিন ফিরে এস, দেখতে পাবে—তোমার ছেলেকে আমি মানুষ করে তুলেছি।"

দীর্ঘ দিন কেটে যায়।

সিধু সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রাত্রে শুয়ে পড়ে, অন্ধকার তখন চারদিক ঘিরে থাকে নিবিড় ক'রে।

বায়স্কোপের ছবির মতই অতীতের সহস্র ছবি মনের মধ্যে জেগে উঠে মিলিয়ে যায়—বাল্যজীবন, কৈশোর, তারপর যৌবন, পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী, তারপর—তারপর তার খোকা—

বুকটা যেন ফেটে যায়, সিধু দুই হাতে বুকখানা চেপে ধরে! কাঁদতে পারলে ভাল হয়; কিন্তু সিধু যে কাঁদতে পারে না, তার দেহখানা শুধু থর থর করে কাঁপে।

সে কি বেঁচে আছে, বেঁচে থাকতে পারে অতদিন? শান্ত

বলেছে তাকে মানুষ করবে, তাই কি হতে পারে? চোরের ছেলে—রক্তে যে তার চুরির প্রবৃত্তি মিশানো, সে সৎ হবে কি করে? যদি বেঁচে থাকে, সেও হবে চোর, ডাকাত—খুনে!

সিধু দুই হাতে মুখ ঢাকে—ভগবান—ভগবান, না, তাকে বাঁচিয়ো না, তাকে মৃত্যু দাও, সে মরুক। শুধু তার মরণের সংবাদটা সিধু যেন পায়, সেদিন সে সত্যই ভূমিষ্ঠ হয়ে তোমায় প্রণাম করবে। মরুক সে, তার পিতা সর্ব্বান্তঃকরণে কেবল সেই প্রার্থনাই করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসরও কেটে যায়।

কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। কত লোক আণ্ডামানে এল, কেউ তার খোকার খবর রাখে না।

বৎসরের পর বৎসর চলতে তার মুক্তির দিনও ক্রমে এগিয়ে আসে।

খুব ভালো ভাবে কাজ করবার জন্য সে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠেছিলো। সাহেব তাকে স্নেহ করতেন, মাঝে মাঝে বখশিস্ দিতেন। তার সব অর্থ সে তাঁর কাছে জমিয়ে রেখেছিল।

সেই সঞ্চিত অর্থ হতে সে এবার কিনতে আরম্ভ করলে নানা রকম খেলার জিনিষ, পুঁতির মালা, ঝিনুকের নানা রকম খেলনা। সে ভাবতে ভুলে গেল তার খোকা আর ছেলেমানুষ নাই, সে এখন তেইশ চব্বিশ বৎসরের যুবক।

সে আজও যার স্বপ্ন দেখে—সে খোকা শিশু, পাঠশালায় পড়ে, লাট্টু ঘুরায়, খেলার জিনিষ নিয়ে সব ভুলে যায়।

একদিন মস্ত বড় একটা পুঁটলি নিয়ে সে যখন ষ্টীমারে উঠল, তখন মনে হচ্ছিল তার দেশ—তার সবুজ শ্যামল দেশের কথা। সব ছাপিয়ে জাগাচ্ছিল—তার খোকা—সে তাকে দেখে কি বলবে—কি করবে!

সে ভুলে গিয়েছিল—যখন সে এসেছিল, তখন সে ছিল যুবক—শক্তিমান্ স্বাস্থ্যপূর্ণ পুরুষ, এখন সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে, সে শক্তি-সামর্থ্য তার নেই। চোখে আজ সে ভাল দেখতে পায় না, চলতে গেলে পা কাঁপে।

কেউ চিনতে পারে না—

পরিচিতেরা সরে যায়, বলে—"কে তুমি? তোমায় চিনি নে।"

এই অপরিচিত জনসমুদ্রের মধ্যে কোথায় তাহার বন্ধু শান্ত,—কোথায় তার খোকা?

সেই বৃহৎ পুঁটলি ঘাড়ে করে, শুষ্কমুখে সিধু পথে পথে ফেরে।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পরিচিত পানওয়ালা রামদীনের সঙ্গে, আশ্চর্য্য একমাত্র রামদীন তাকে চিনতে পারলে—

"তাই তো; সিধু যে, কবে ফিরলে—ভাল আছ তো?"

ঘারে পুঁটলি নামিয়ে আশ্বস্ত ভাবে বসে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিধু বললে, "আর ভাল, ছেলেটার একটা খোঁজ পেলুম না—"

"তোমার ছেলে,—এই নরেশ তো ? ও, সে তো এখন খুব বড় লোক, চুনি বাবুর জামাই—অনেক লেখাপড়া শিখেছে—"

সিধু বিশ্বাস করতে পারে না, চুনিবাবুর জামাই তার নরেশ, অনেক লেখাপড়া শিখেছে !

কিন্তু বিশ্বাসও করতে হল। চুনিবাবু তাকে ছোটবেলা হতে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন। সিধুকে তিনি চিনিতেন, তার বংশ পরিচয়ও অজ্ঞাত ছিল না।

তিল মাত্র দেরী না করে সিধু উঠল, আবার সেই বোঁচকা ঘাড়ে তুললে।

রামদীন বলেছিল, নরেশ তাকে চিনতে পারবে না, কিন্তু তাতেই বা কি ? সে নরেশকে চেনা দিতে চায় না, নিজে সে তার কাছে আজীবন মৃত হয়েই থাক। সে একবার শুধু দেখতে চায়, দূর হতে দেখে সে তার উপহার কয়টিকে কোন রকমে পৌছে দিয়ে আসবে।

চুনিবাবুর বৃহৎ অট্টালিকার সামনে সে পৌছাল—দ্বারবান্ ভিতরে ঢুকতে দিল না। অনুনয় করে সিধু বললে, আমি ভেতরে যেতে চাই নে বাবা, কেবল এই জিনিস কয়টা তোমার জামাই বাবুকে দিয়ে বল—আন্দামান হতে একজন লোক এ সব নিয়ে এসেছে।"

অনেক কষ্টে দ্বারবান্ রাজি হল।

সে ভিতরে ঢুকতেই সিধু নিঃশব্দে তার অনুসরণ করলে।

বৈঠকখানায় কয়েকটী যুবক হাসির তুফান তুলেছে—যাকে কেন্দ্র করে এরা বসেছে, সেই সুদর্শন ছেলেটীই যে নরেশ, তাতে সিধুর সন্দেহ রইল না।

দ্বারবান্‌কে ঢুকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি চাই রাম সিং ?"

রামসিং ঝিনুকের খেলনা তার সামনে টেবলের উপর রেখে সবিনয়ে বললে, "একজন লোক এইগুলো আপনাকে দিতে আন্দামান হতে এসেছে হুজুর—"

"আন্দামান হতে—"

বন্ধুরা হো-হো করে হেসে উঠল, "ওহে নরেশ, তোমার কোন সম্বন্ধী আন্দামানের হাওয়া খেয়ে ফিরল হে, তাকে ডাকো—আদর যত্ন কর।"

নরেশ মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব রইল—তার পরই অকস্মাৎ জ্বলে উঠে এক ধাক্কায় জিনিসগুলো ফেলে দিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল —"এখনি বার করে দাও তাকে, তার সব জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দাও গিয়ে। বল গিয়ে আন্দামানের কয়েদীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই—"

নিঃশব্দে সবগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দ্বারবান্ যখন বাইরে এলো, তার একটু আগেই সিধু চলে গেছে।

তার জিনিস সে দিয়েছে এই তার তৃপ্তি, সে তার নরেশকে

শিক্ষিত হয়ে ভদ্রভাবে দশজনের একজন হয়ে থাকতে দেখেছে, এই তার আনন্দ। আজ নিজের পরিচয় দিয়ে সে তার নরেশকে সকলের কাছে হেয় করতে চায় না।

কেউ যদি দেখত, তা হলে দেখতে পেত—সিধু দুই হাত জোড় করে কপালে ছুঁইয়ে বলছে—"বেশ করেছ ঠাকুর, আমার এতটুকু দুঃখ নেই। আমার খোকা মরেছে, বেঁচেছে নরেশ, ওকে ওখানেই রেখো দেবতা—আমার আওতায় এনো না।"

নিঃস্বার্থ পিতৃহৃদয়—

নিজের সর্ব্বস্ব হারিয়েও সে সুখী—এত বড় অপমানেও তার দুঃখ নাই।

মহতের দান

জ্যোৎস্নাধৌত রজনীতে একা সিরাজ চুপ করিয়া প্রাঙ্গণে একটা খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। বারাণ্ডায় তাহার বিধবা ভগিনী রহিমা রন্ধন করিতেছিল। মাঝে মাঝে আপনা আপনিই বলিতেছিল; সিরাজের কানে শুধু তাহার স্বরটা ভাসিয়া আসিতেছিল, কথাগুলা বুঝিবার সে আদৌ চেষ্টা করে নাই, কারণ তাহার মনটা তখন নিজের চিন্তাতেই ভারী হইয়া উঠিয়াছিল।

আকাশ-ভরা শুভ্র চাঁদের আলো; পৃথিবী চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে; তাহার উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে তাহাই যেন হাসিয়া উঠিয়াছে। দূরে নদীর ধারে রাত্রিচর পাখী এক একবার বিকট কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—তাহার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

বড় নিস্তব্ধ রাত্রি; সেই রাত্রিচরগুলার মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ কোথাও শব্দ হইতেছিল না। সিরাজ আকাশের পানে চাহিয়াছিল, শ্রান্ত দেহ তখন তাহার এলাইয়া পড়িয়াছে. চক্ষু দুইটাও বেশ মুদিয়া আসিয়াছে. এমন সময় বাহির হইতে কে কর্কশ কণ্ঠে ডাকিল—'মিঞা সাহেব, বাড়ী আছ ?'

এক মুহূর্ত্ত প্রকৃতির শান্ত ভাবটাতে অশান্তির ধাক্কা লাগিয়া সব যেন উলট-পালট হইয়া গেল। সিরাজের বুকটা একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিল, তন্দ্রা নিমিষে দূর হইয়া গেল ; উঠিয়া সে বলিল—'কে ডাকে ?'

বাহির হইতে উত্তর আসিল, আমি জমিদার বাবুর পাইক।'

সিরাজ উঠিয়া বাহিরে আসিল। পাইক স্বরূপ দাস মোটা বাঁশের লাঠিটার ভর দিয়া ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দৃষ্টি পাতলা বাঁশের বেড়া ভেদ করিয়া রন্ধন-গৃহের আলোকোজ্জল বারাণ্ডার উপর পড়িয়াছিল।

সিরাজকে দেখিয়াই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'তোমায় এখনি যেতে হবে।'

সিরাজ বিস্মিত ভাবে বলিল, 'কোথা ?'

স্বরূপদাস বলিল 'জমিদার বাবু, তোমায় জোর তলপ দেছেন, এখনি যাওয়া চাই।'

সিরাজ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।'

স্বরূপদাস তাহাতে কোন মতে রাজি হইল না, বলিল, 'তিনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবার আদেশ দেছেন।'

বিরক্ত হইয়া সিরাজ বলিল, 'বাপু আমি পালাচ্ছিনে, তুমি বল গে যাও আমি যাচ্ছি।

অগত্যা স্বরূপ দাসকে প্রস্থান করিতে হইল, কিন্তু যাইবার আগে আর একবার ফাঁক দিয়া রন্ধনগৃহের পানে তাকাইয়া যাইতে ভুলিল না।

সিরাজ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। জমিদার মহাশয় যে কেন তাহাকে ডাকিয়াছেন তাহা সে জানিত। তাহার আমবাগান সহ একটি পুষ্করিণী ছিল, জমিদার মহাশয়ের তীব্র দৃষ্টি এই আমবাগানটার উপরে। এই বাগান ও পুষ্করিণী তাঁহারই বাড়ীর লাগালাগি। একদিন এমন দিন ছিল. যে সিরাজের পূর্ব্বপুরুষ ও জমিদার তারানাথ গাঙ্গুলীর পূর্ব্ব পুরুষ সমপদস্থ ছিলেন। কালক্রমে সিরাজ আজ নিঃস্ব, পথের ভিখারী বলিলেও অযথার্থ হয় না; তারানাথ বাবু বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে যখন গাছগুলি আমে পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন বোধ হয় তারানাথ বাবু লোভ সামলাইতে পারিতেন না। বাড়ীর মেয়েরা কাঁচা ফজলী, কাঁচামিঠা আমগুলি যথোচিত রূপ বর্দ্ধিত হইবার পূর্ব্বেই নিঃশেষ করিয়া ছাড়িতেন। সিরাজ এ ক্ষতি সহ্য করিয়া যাইত, বাড়ীতে আর আম আসিত অতি সামান্য। পুষ্করিণীটি যেন তারানাথ বাবুরই ছিল। সিরাজকে না বলিয়া তাঁহারা তাহাতে বেশ মাছ ধরিতেন। রহিমা এক একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, কিন্তু শান্তপ্রকৃতি সিরাজ তাহাকে থামাইয়া দিত। যা' দুই চারিটা আম, মাছ ঘরে

আসে, তাহাদের দুই ভাই বোনের পক্ষে তাহাই অপরির্য্যাপ্ত হইয়া উঠে। পরে খাইয়া সন্তুষ্ট হয় হোক্ তাহাতে ক্ষতি কি ?

কিন্তু রহিমা তাহা বুঝে না। সে মনে করে ক্ষতি ইহাতে যথেষ্ট! আম ও মাছগুলা যদি বিক্রয় করা যায়, তাহাদের আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভাল হয়। অবস্থা বিপর্য্যয়ে আজ তাহারা দরিদ্র ; পরিধেয়ের অভাবেও অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়, মাছ, আম বৎসরে একবার করিয়া বিক্রয় করিলেও তাহাদের অভাব সঙ্কুলান হয়।

সে দিন রহিমা কাহার মুখে যখন শুনিতে পাইল তারানাথ বাবুর নাতির অন্নপ্রাশনোপলক্ষে বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে এবং সেই ভোজের উপযুক্ত মাছ তাহাদের পুষ্করিণী হইতে সরবরাহ করিয়াছে, তখন তাহার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা বড় দুঃসহনীয় হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া আসিয়া সিরাজকে খুবই ভৎ´সনা করিল ; তাহার চীৎকার সেদিন বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, সিরাজ কোন মতেই তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিল না।

রহিমার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বামী বিবাহের কিছুদিন বাদেই মারা যায়, সে আর বিবাহ না করিয়া ভাইয়ের সংসারে আসিয়া বাস করিতেছিল। তাহার একটী দোষ ছিল, রাগ হইলে সে কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিত না। নিরীহ সিরাজ পর্য্যন্ত তাহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া পড়িত।

তাহাকে একটা কথা বলিবার যো ছিল না, তা হইলেই সে পা ছড়াইয়া বসিয়া স্বর্গগত মাতা পিতাকে স্মরণ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিত। সিরাজ এই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত ভয় করিত, একটা কথাও সে বলিত না। বোনকে সে যেমন ভালবাসিত, তেমনি ভয়ও করিত।

সিরাজ বাড়ীর মধ্যে আসিতেই রহিমা অগ্রসর হইয়া আসিল—'কে ডাকছিল দাদা ?'

সিরাজ একটু অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর দিল, 'জমিদারের পাইক। তোর জন্যেই যত লেঠা আমার। দিব্য দিন কেটে যায়, তুই হতভাগী যত লেঠা বাধাস। এখন জমিদার ডেকে পাঠিয়েছে, কি করি বল্ দেখি ? তোর সে দিনকার গালাগালি করাটা মোটেই ভাল হয় নি রহিমা।'

রহিমা দর্পভরে উত্তর করিল 'না, ভাল হয় নি বই কি; ডেকেছে তাতে এত ভয় কিসের ? তুমি যেন কি দাদা—বড় ভয় তোমার। আমি যদি পুরুষ হতুম, নিজেই সব করতুম। ওরা আমাদের জিনিষ নিয়ে ভোগ করবে, আর আমরা পথে ভিক্ষে করে বেড়াব—না ? কি মজার কথা বেশ—।'

সিরাজ একটা অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনটা ভারি কোমল ও কল্পনাপ্রবণ ছিল। একটা ক্ষুদ্র চিন্তা একবার তাহার মাথায় প্রবেশ করিলে আর নিস্তার ছিল না, সেইটাই তাহার সমস্ত বুদ্ধি গ্রাস করিয়া

মোটা জোঁকের মত ফুলিয়া উঠিত; তখন সে আপনাকে বিপদাবর্ত্তে পতিত দেখিয়া আত্মহারাপ্রায় দাঁড়াইয়া থাকিত।

রহিমার কথা শুনিয়া রাগত ভাবে সে বলিল, 'তোর আর কি? খাবি আর ঘরের মধ্যে বসে থেকে আমার সঙ্গে ঝগড়া চালাবি। যত বিপদের বোঝা আমার মাথায় চালাবি। আমার হয়েছে বিষম জ্বালা তোকে নিয়ে।'

রহিমার হৃদয়ে অভিমান জাগিয়া উঠিল; সে সিরাজের 'ভার' হইয়াছে। কথাটা মনে করিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; সে পা ছড়াইয়া বসিয়া তাহার প্রধান যুদ্ধাস্ত্র কান্নার স্বর বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া বিব্রত সিরাজ বলিল, 'লক্ষ্মী দিদিটী, ওইটি এখন রাখ। কাজ হয়ে থাকে তো ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বস গিয়ে, আমি চট্ করে জমীদার-বাড়ীটা একবার ঘুরে আসি।"

রহিমা অগত্যা রোদন থামাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরের কাজ সারিয়া লইয়া সে গৃহে গেল দেখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে সিরাজ বাহির হইয়া পড়িল।

এই নিরুপমা সুন্দরী কিশোরী বোনটীর জন্য সে মোটেই শান্তি পাইত না। কে কোন্ দিক হইতে পাপ নয়নে ইহাকে দেখিয়া ফেলিবে, কাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে এই জল-ধোয়া শুভ্র পবিত্র যুঁই ফুলটী কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে, এই ভয় তাহার মনে রাতদিন জাগিত। রাত্রে ভগিনীকে গৃহে শয়ন করাইয়া

সে সারারাত জাগিত। রাত্রে ভগিনীকে গৃহে শয়ন করাইয়া সে সারারাত নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত না, কতবার উঠিয়া সে সেই গৃহটীর চারিদিকে ঘুরিত তাহার ঠিক নাই।

হিন্দুপাড়ার মধ্যে সেই একঘর মাত্র মুসলমান বাস করিত। তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য প্রতিবাসী হিন্দুরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, অনেকে সেই বাড়ীটুকুর জন্য ডবল মূল্য দিতেও স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সিরাজ ভিটাত্যাগ করিতে একেবারেই নারাজ। তাহার বহু পূর্ব্বপুরুষের ভিটা, তাহার পিতা মাতাও এখানে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; এস্থান সিরাজের নিকট স্বর্গ বিশেষ।

জমিদার বাড়ী হইতে যখন সে ফিরিল, তখন রাত চারটা বাজিয়া গিয়াছে। রহিমা তখনও ঘুমায় নাই। সিরাজের সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল সে বারাণ্ডার এক ধারে বড় কাতর ভাবে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ বড় ম্লান।

আলোটা সামনে রাখিয়া রহিমা ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'ল দাদা?'

দাদা আকাশের পানে চাহিয়াছিল, কোনও মতে চোখ নামাইতে সমর্থ হইল না, পাছে চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে, পাছে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া যায়।

রহিমা আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'জমিদার কি বললে দাদা?'

সিরাজ উদাসভাবে উত্তর দিল, 'যা বলে গেছলুম রহিমা, যা ভেবেছিলুম—তাই।'

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সামনের জ্যোৎস্না-সিক্ত নারিকেল গাছটার উপর একটা পেচক আসিয়া বসিল, গম্ভীর-ভীষণ-শব্দে নিস্তব্ধ রজনীকে মুখরিতচঞ্চল করিয়া তুলিল। রজনীর শীতল বাতাস শন্ শন্ করিয়া আসিয়া সিরাজের ঘর্ম্মাক্ত ললাটটাকে শীতল করিয়া দিয়া যাইতে লাগিল।

রহিমা আর একটাও কথা কহে না দেখিয়া সিরাজ তাহার পানে চোখ রাখিল—'বুঝেছিস রহিমা, তারা এখন বাগান পুকুর সিকি দরে কিন্‌তে চায়।'

রহিমা বলিল, 'তা তুমি দেবে কেন?'

সিরাজ ম্লান হাসিল, বলিল, 'দেব কেন? বাধ্য হয়ে আমায় দিতেই হবে।'

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া রহিমা বলিল, 'দিতেই হবে? কেন?'

সিরাজ বলিল, 'জোর যার মুল্লুক তার—জানিস তো এ কথা, আমি যে জমিদারের সঙ্গে লড়তে যাব—কি আছে আমার বল্ দেখি? আমার কি একটা পয়সা আছে—না লোক আছে?'

রহিমা বলিল, 'আমাদের খোদা আছেন।'

সিরাজ মাথা নাড়িল, 'না রহিমা—খোদা আমাদের নেই। খোদা গরীবের নয়, খোদা বড়লোকের। তা' যদি না হবে

সিরাজ উদাসভাবে উত্তর দিল, 'যা বলে গেছলুম রহিমা, যা ভেবেছিলুম—তাই।'

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সামনের জ্যোৎস্না-সিক্ত নারিকেল গাছটার উপর একটা পেচক আসিয়া বসিল, গম্ভীর-ভীষণ-শব্দে নিস্তব্ধ রজনীকে মুখরিত-চঞ্চল করিয়া তুলিল। রজনীর শীতল বাতাস সন্ সন্ করিয়া আসিয়া সিরাজের ঘর্ম্মাক্ত ললাটটাকে শীতল করিয়া দিয়া যাইতে লাগিল।

রহিমা আর একটাও কথা কহে না দেখিয়া সিরাজ তাহার পানে চোখ রাখিল—'বুঝেছিস রহিমা, তারা এখন বাগান পুকুর সিকি দরে কিন্‌তে চায়।'

রহিমা বলিল, 'তা তুমি দেবে কেন?'

সিরাজ ম্লান হাসিল, বলিল, 'দেব কেন? বাধ্য হয়ে আমায় দিতেই হবে।'

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া রহিমা বলিল, 'দিতেই হবে? কেন?'

সিরাজ বলিল, 'জোর যার মুল্লুক তার—জানিস তো এ কথা, আমি যে জমীদারের সঙ্গে লড়তে যাব—কি আছে আমার বল্ দেখি? আমার কি একটা পয়সা আছে—না লোক আছে?'

রহিমা বলিল, 'আমাদের খোদা আছেন।'

সিরাজ মাথা নাড়িল, 'না রহিমা—খোদা আমাদের নেই। খোদা গরীবের নয়, খোদা বড়লোকের। তা' যদি না হবে তবে ভিক্ষুক ভিক্ষা কর্‌তে বড়লোকের দরজায় গেলে গলাধাক্কা

খেয়ে কেঁদে আসে কেন ? গরীবের বুক বাঁশ দিয়ে বড়লোকে ডলে যায় কেন ? খোদা আমাদের নেই রহিমা, তা হলে আজ বড়লোকে আমায় যা তা কথা বলতে পারত না। যে সব জঘন্য কথা আমায় বলেছে তারা, তা যদি শুনতিস্ একবার, বুক ধরে সেখানেই বসে পড়তিস্। আমি যদি সিকি দামে বাগান পুকুর না ছেড়ে দেই—তারা আমায় জোর করে বাড়ী হ'তে উঠিয়ে দেবে, আর তোকে—ইয়া আল্লা, ভাইয়ের সামনে এত বড় কথাটাও বলে গেল তারা—কোথায় খোদা,—খোদা নেই রহিমা—খোদা নেই।'

বলিতে বলিতে সিরাজ দুই হাতে মুখ ঢাকিল, সে সব কথা বোনের সামনে কোন ভাই-ই উচ্চারণ করিতে পারে না।

রহিমা একবারে জ্বলিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কঠোর-স্বরে সে বলিয়া উঠিল—'দাদা—'

সিরাজ চমকাইয়া মুখ তুলিল। এমন ভীষণ কণ্ঠ রহিমা কোথায় পাইল ? তেমনি স্বরেই রহিমা বলিল, 'তারা আমার নামে অত কথা বললে আর তুমি ভাই হয়ে তা শুনে আসলে ? তোমার বুকে রক্ত নেই, তোমার হাতে বল নেই, মায়ের ছবি তোমার মুখে পড়ে নি ?'

সিরাজ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'আমি যে একা রহিমা ?'

রহিমা উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল, 'কে বললে তুমি একা ? ধর্ম্ম তোমার সহায়, তোমার ভয় কি ? তুমি বুক বেঁধে দাঁড়াও

দাদা, বিপদ আসে আসবে, আমরা তা সহ্য করব, তা' বলে তারা যে আমাদের গরীব বলে পায়ে দলবে, যা না তাই বলবে, এ কখনই আমরা সহ্য করতে পারব না।'

সিরাজ ভগিনীর মুখপানে চাহিল, রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, 'আমি দাঁড়াব, কিন্তু যদি আমার কিছু হয় রহিমা—'

রহিমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কিছু ভেবনা দাদা, শুধু একমনে বিশ্বাস করে যাও খোদা আছেন, আর তিনি শুধু বড়লোকের নন, গরীবেরও বটে।'

দুই ভাই বোনের কেহই সে রাত্রে জলস্পর্শ করিল না। উষ্ণ মস্তিষ্ক সিরাজ সে রাত্রে ঠাণ্ডায় উঠানে খাটিয়ার উপর জ্যোৎস্নার আলোয় পড়িয়া রহিল, রহিমা গৃহে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু সারারাত ঘুমাইতে পারিল না।

হিন্দুদের অত্যাচারগুলার কথা যতই তাহার মনে পড়িতে লাগিল ততই সে অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। জাতির অভিমানটা কি এতই বড়, মানুষ কি কিছু নয়? উহারাও তো জানে একস্থান হইতে হিন্দু মুসলমান সবাই আসিয়াছে, যাইবেও সেই এক জায়গায়। জানিয়া শুনিয়াও কেন তবে এ ভেদজ্ঞান, মাঝখানে কেন এত দূরত্ব? তাহারা যে এখানে থাকে কোন হিন্দুরই তাহা ইচ্ছা নয়। সকলে কেন এত তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে?

সকাল বেলার দিকে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। গৃহের বেড়ায় যে মাটি লেপা ছিল

তাহা অনেক স্থানে খসিয়া পাড়িয়াছে, সেই সব ফাঁক দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

বাহিরে কাহার আহ্বান শুনিয়া সে ধড়ফড় করিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সিরাজ তখনও প্রাঙ্গণে সেই খাটিয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রভাতের সূর্য্যের আলো তাহার ঘুমন্ত মুখখানার উপর পড়িয়া, দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় সারারাত মানসিক উৎকণ্ঠায় সে ঘুমাইতে পারে নাই. ভোরের সময় ঘুমাইয়া পড়ায় এত বেলাতেও সে জাগিতে পারে নাই। বাহিরে দেওয়ান সিরাজকে ডাকিতেছিল, তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। জমীদার বাবুর মহা প্রতাপান্বিত আদরের দেওয়ান অবশেষে অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

রহিমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল, মনে হইল সে একবার মুখ সামলাইতে বলে, তখনি মনের ভাব সামলাইয়া সিরাজকে ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দাদা ওঠ, তোমায় ডাকছে।'

সিরাজ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল; দুই হাতে চোখ ডলিয়া ভগিনীর পানে চাহিয়া বলিল, 'উঃ, এত বেলা হয়ে গেছে, আমায় এতক্ষণ ডাকিস নি কেন রহিমা?'

রহিমা বলিল, 'আমি এইমাত্র উঠলুম। বাইরে কে ডাকছে।'

যদিও সে দেওয়ানকে বেশ চিনিত, তথাপি কেবল অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃই দেওয়ানের নাম মুখেও আনিল না, 'কে ডাকছে' বলিয়া কথাটা সারিয়া দিল।

সিরাজ উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

দেওয়ান বেড়ার বাহির হইতে প্রস্ফুটিত পদ্মসমা রহিমার পানে চাহিয়াছিলেন, সিরাজের আগমন তিনি জানিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই লুব্ধ দৃষ্টি দেখিয়াই সিরাজের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া কঠোর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ও কি মশাই, আপনি না ভদ্রলোক—'

দেওয়ান ভারি অপ্রস্তুত হইয়া চোখ ফিরাইলেন, 'হ্যাঁ, এই তোমার বাড়ী-ঘরগুলো দেখছিলুম। এই বেড়ার ঘরে থাক নাকি তোমরা?'

সিরাজ ললাটে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া বলিল, 'নসিব! আপনার কোন দরকার আছে আমার কাছে?'

দেওয়ান বলিলেন, 'জমীদারবাবু কাল বলে দিয়েছিলেন, তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা করতে; তোমার বোন কি বললে তা' জানতে আমায় পাঠালেন; তা' হলে আজই সব লেখা পড়া ঠিক ঠাক হয়ে যায়।'

সিরাজ বিরক্ত হইয়া বলিল 'আমার বোন এর জানে কি, আমি তো কালই সে কথা বলে এসেছি।'

দেওয়ান বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলিলেন, 'সে দ্বিতীয় নুরজিহান, সে কিছু জানে না?'

সিরাজ ভয়ানক রাগিয়া উঠিল, তাহার বড় বড় চোখ দুটিতেই রাগ প্রকাশ হইয়া পড়িল। একটুখানি নীরব থাকিয়া

সে বলিল, 'বলবেন, আমি বাগান, পুকুর বিক্রী করব না, সাফ জবাব নিয়ে যান।'

দেওয়ান উষ্ণভাবে বলিলেন. 'কিন্তু এর ফল তোমায় ভোগ করতে হবে। জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করা অমনি মুখের কথা নয়। এর শেষটা কোথায় কি ভাবে দাঁড়াবে, সেটা ভেবে উত্তর দিলে হ'ত নাকি?'

সিরাজ বলিল, অনেক ভেবে দেখেছি মশাই, আর ভাবতে পারা যায় না। আপনি এই কথাই জমীদারবাবুকে বলবেন।'

দেওয়ান বলিলেন, 'কিন্তু তোমার সবই যাবে, লাভে হ'তে একটী পয়সাও পাবে না তা আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।'

সিরাজ আবার রাগিয়া উঠিল, 'আপনি কি ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে? কি আমার যাবে? রীতিমত খাজনা দিয়ে বাস করছি, আদালত আছে, আল্লা আছেন।'

'আল্লা আদালত সবারই সহায়' বলিয়া দেওয়ান ফিরিলেন।

সিরাজ রহিমার কাছে গিয়া রাগত কণ্ঠে বলিল, তোকে পোড়ারমুখি বার বার বলি, কারও সামনে বার হোসনে; যত বলব—তত তুই যেন কি হবি।'

রহিমা সানুনাসিক স্বরে বলিয়া উঠিল, 'কার সামনে আমি বার হই তা বল না?'

সিরাজ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তোর আর এখানে থাকা হবে না রহিমা, তোকে তোর শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে

দেব। তুই সেখানে থাকলে আমার কিছু ভয় থাকবে না। তুই যদি কালো ভূতের মত হতিস, আমার কিছু ভয় হ'ত না।'

রহিমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'তা বুঝি আমার দোষ! আমি তো এক্ষুণি কালো ভূত হ'তে চাই, কিছু করে তা' হওয়া যায় না দাদা?'

সিরাজ মলিন হাসিল। 'দূর পাগলী তাকি হয়? আমি আজ তোর শ্বশুরকে পত্র লিখে দেই তোকে নিয়ে যেতে। তারা তোকে যে রকম আবরুতে রাখবে আমার সে রকম রাখবার ক্ষমতা নেই। এ রকম বে-আবরুতে তোকে আমি আর রাখতে পারব না।'

রহিমা রাগ করিয়া কথা কহিল না।

সেইদিনই তারানাথ বাবু তাহাকে জোর তলপ দিলেন, কিন্তু সিরাজ গেল না। তিনি এই দুর্ব্বৃত্ত বিধর্ম্মী যুবকের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন, এবং কি করিয়া যে ইহার সর্ব্বনাশ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

দেওয়ান বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ করবার ভাবনা কি? আমায় আদেশ দিন না, আমি দেখি একবার।'

তারানাথ বাবু বলিলেন, 'তুমি কি করতে পারবে?'

দেওয়ান বলিলেন, 'আমি না পারি কি বলুন। এই ছোকরা মুসলমানটাকে জব্দ করতে কতক্ষণ সময় যাবে?'

সে দিন দুপুরে—যখন পথে ঘাটে কোথাও একটী লোক ছিল

না, তখন রহিমা তাহার দৈনিক জল ঘাট হইতে তুলিয়া আনিতেছিল। সম্মুখেই পথের উপর দেওয়ানকে দেখিয়া সে সন্ত্রস্তে পাশ কাটাইতেছিল, কিন্তু দেওয়ান ভদ্র ভাবে অগ্রসর হইয়া একখানা পত্র দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, 'আমাকে দেখে লজ্জা করবার কোন কারণ নেই রহিমা, আমি তোমায় এতটুকু বেলা হ'তে দেখে আসছি। আমি শুনেছি তুমি বেশ লেখাপড়া জান ; এই পত্রখানা নিয়ে গিয়ে পড়গে, এতে তোমারই ভাল হবে।'

পত্রখানা সামনে ফেলিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রহিমা একবার ভাবিল, পত্রটা ফেলিয়া দিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া সেখানা তুলিয়া লইয়া সে বাড়ী আসিল। সিরাজ তখন বাড়ী ছিল না, আত্মীয়দের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিল।

রহিমা কলসীটা রাখিয়া আগেই পত্রখানা পড়িতে লাগিল। যখন পত্র পড়া শেষ হইল তখন তাহার শুভ্র মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বড় বড় দুটী চোখ দিয়া আগুনের ঝলক বহিয়া যাইতেছে। সে পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্রখানা কি সে সিরাজকে দেখাইবে ? এ পত্র দেখাইলে রাগের মাথায় সে হয় ত জমীদারকে খুন করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু সে কেমন করিয়া এ পত্র লুকাইবে ? এ কি ভয়ানক কথা বহন করিয়া আনিয়াছে !

রহিমা খানিক গুম হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া গৃহে প্রবেশ

করিল, দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া স্বর্গীয় পিতা মাতা ও প্রিয়তম স্বামীকে ডাকিয়া খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

হায়! আজ যদি তাহার স্বামী থাকিত! পিতা যাহার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সেই রক্ষণা-বেক্ষণের কর্ত্তা আজ কোথায়? সে তাহার স্ত্রীকে জগতে একা ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে কোন্ দেশে গিয়াছে? জগতের লোক যে এত নিষ্ঠুর—তাহারা যে স্ত্রীকে স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিবার বিরোধী, তাহা সে জানে নাই। আজ যদি সে থাকিত! করুণাময় খোদা, রহিমাকে তাহার পরিবর্ত্তে লইলে না কেন?

বাহিরে সিরাজের সাড়া পাইবা মাত্র সে পত্রখানা তাড়াতাড়ি শতখণ্ড করিয়া জানালা পথে বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর মুখে চোখে প্রফুল্লতা আনিয়া বাহিরে ভ্রাতাকে বসিতে জায়গা দিয়া বলিল, 'কি হ'ল দাদা?'

সিরাজ বসিয়া বলিল, 'সবাই বাগান ছাড়তে নিষেধ করছে। তাই কি ছাড়া যায় রহিমা? কত পুরুষ আমাদের ওই বাগান, পুকুর দখলে রেখেছে, আমি অমনি ছেড়ে দেব?'

রহিমা শুধু 'বেশ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সিরাজ তাহার গম্ভীর মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, 'তোর মুখখানা আজ এমন ভার দেখাচ্ছে কেন রে?'

রহিমা মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আমি আর এখানে থাকব না দাদা, আমায় শিগগীর করে আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও।'

সিরাজ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা বেশ, যাবি তার আর কি? কিন্তু আমি সেদিন রাগ করে বলেছিলুম বলে কি তুই যেতে চাচ্ছিস রহিমা, তাই আগে বল।'

রহিমা বলিল, 'না, সেজন্যে নয়, আমার ইচ্ছে আমি যাব' বলিয়া সে গৃহে চলিয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, অন্ধকার নীরবে ধরা বক্ষ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, সিরাজ সেই অন্ধকারে একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ভাবনা অনন্ত। প্রবল প্রতাপ জমীদারের সহিত সে বিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, কে জানে ইহার শেষ কোথায়? যাহারা তাহাকে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি দিতেছে, বিপদের সময় তাহারা সরিয়া পড়িবেই। সে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, এখন সে কি পিছাইবে, না অগ্রসর হইবে? না, আর সে পিছাইবে না। সে পিছাইবে কেন? তাহারই পিতার সম্পত্তি অন্য লোকে যে সচ্ছন্দে গ্রাস করিবে তাহা কখনই হইবে না। হউক না সে জমীদার, থাকুক তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য, সে সব সেই দীন হুনিয়ার মালিকের চোখে ঠেকিবে না। তিনি দেখিবেন কেবল ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য।

সিরাজ একবার নক্ষত্রোজ্জ্বল অনন্ত গগনের পানে চাহিল,

তাহার দুটি চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, সে মাথা নত করিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, দীন দুনিয়ার মালিক, এর ন্যায্য বিচার তুমিই করো!'

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল; জমীদার পক্ষ নীরব ছিলেন, ইহার পর বেশী কথা তাঁহারা আর বলেন নাই। সিরাজ একটু নিশ্চিন্ত হইল। ব্যাপারটা যদি এমনিই মিটিয়া যায় তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়। এ গোলমালের মধ্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য সে ভারি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এ নীরবতা বেশীদিন রহিল না—সেদিন জমীদার বাবুর নাম স্বাক্ষরিত রহিমার নামীয় একখানা পত্র আসিয়া পড়িল সিরাজের হাতে। সিরাজ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, রহিমা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল।

জীবনাপেক্ষা ভালবাসে সে রহিমাকে। রহিমাকে সে বড় যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছে, উপদেশ দ্বারা তাহার হৃদয়কে উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। সে বোনকে বুকের আড়ালে গোপন করিয়া রাখিতে চায়—যেন কেহ তাহার সন্ধান না পায়। সারারাত সে না ঘুমাইয়া পাহারা দেয়। যাহার জন্য সে তিলার্দ্ধ শান্তি পায় না, তাহাকে লোকে এই কটুক্তিপূর্ণ পত্র দিবে?

'আজ খুন করব—সব খুন করব' বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। সভয়ে রহিমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সজল চোখে রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল,—'দাদা'।

'রহিমা, ঈশ্বর যথার্থ ই নেই—' বলিতে বলিতে সিরাজ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কনিষ্ঠার কোলে মাথা রাখিল ; ঝর ঝর করিয়া রহিমার চোখের জল তাহার মাথার উপর পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে রহিমা চোখ মুছিয়া বলিল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন দাদা ?"

'ব্যস্ত' সিরাজ মুখ তুলিল, তীব্র নেত্রে রহিমার পানে চাহিয়া বলিল, 'স্থির হতে বলছিস কাকে রহিমা ? তোকে রাখবার জায়গা যে আমি পাচ্ছিনে। তোর শ্বশুরকে পত্র দিছি, সে তোকে নিয়ে গেলে যে আমি বাঁচি। ওরা বাগান পুকুর সব নেয় নিক ; চল, আমরা দুটি ভাই বোনে এ দেশ ছেড়ে চলে যাই। তোকে তোর শ্বশুরবাড়ী পৌছে দিয়ে আমি ফকিরী নিয়ে পথে বেড়াব।'

রহিমা নীরবে কেবল চোখের জল ফেলিতে লাগিল। তাহার জন্য সিরাজের উৎকণ্ঠা যে কতদূর তাহা সে জানিত। সে যত বড় হইতেছিল ততই সিরাজ তাহাকে লুকাইয়া রাখিতেছিল। তাহার স্বামীর মৃত্যুর পরে আত্মীয়েরা রহিমার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাই বোন কেহই তাহাতে রাজি হয় নাই। হিন্দু পাড়ার মধ্যে বাস করিয়া তাহারা হিন্দুর অনেক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল, দ্বিতীয়বার বিবাহ করা ব্যভিচার ভাবিয়া দুইজনেই মাথা নাড়িল।

সিরাজের হৃদয় যত জলিতেছিল সে ততই আস্ফালন করিতে

লাগিল। তাহার আস্ফালন তারানাথ বাবুর অজ্ঞাত রহিল না। তিনি সিরাজের নামে নালিশ রুজু করিয়া দিলেন।

সিরাজ আরও রাগিয়া উঠিল। গৃহে যাহা কিছু ছিল সব বিক্রয় হইয়া গেল, রহিমার যে সব গহনাপত্রাদি ছিল তাহাও গেল, সে কিছুতেই হটিতে চাহিল না।

সেদিন সহর হইতে ফিরিতে রাত আটটা বাজিয়া গেল; আসিয়া আহারান্তে সে বাহিরে নিজের খাটিয়াতে শুইয়া পড়িল; রহিমা গৃহের মধ্যে শয়ন করিল। পরিশ্রান্ত সিরাজ পড়িবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

কত রাত্রে—সে তাহা জানে না, রহিমার চীৎকারে ও গায়ে অগ্ন্যুত্তাপ লাগায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। একি ভীষণ! সামনে ধু ধু করিয়া দুখানা গৃহ জ্বলিতেছে, রন্ধনের চালাটীও এই সময় আগুন ধরিয়া গেল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সিরাজ শুধু চাহিয়া রহিল। গৃহমধ্য হইতে রহিমা ব্যাকুল কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছিল; সিরাজ লাফ দিয়া প্রজ্বলিত বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল।

এ আবার কি? দরজা বাহির হইতে শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা। মাথার উপর হইতে আগুনের ঝলক হু হু করিয়া নামিয়া আসিতেছে, সমস্ত দেহটা তাহাতে ঝলসাইয়া উঠিতেছে। এখনি গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিন্তু সিরাজের তাহাতে দৃষ্টিপাত নাই, সে তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ডাকিয়া ডাকিয়া রহিমা

তখন চুপ করিয়াছিল, সিরাজ ডাকিল, 'রহিমা—আছিস এখনও ?'

ক্ষীণকণ্ঠে রহিমা উত্তর দিল, 'আছি দাদা।'

সিরাজ উদ্বেগ কণ্ঠে বলিল, আর একটু—একটু খানি থাক দিদি, আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলি।'

সিয়াজ দরজার উপর লাথি মারিতে লাগিল, সে সবল লাথির আঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দগ্ধ চাল জ্বলিতে জ্বলিতে খসিয়া পড়িল।

অগ্রাহ্য করিয়া সিরাজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চারিদিকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে। সিরাজের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, চোখে অন্ধকার দেখিল, সে প্রাণপণে চাহিয়া দেখিল রহিমা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

ভগিনীকে দুইটী সবল বাহুর উপর তুলিয়া লইয়া সিরাজ এক লম্ফে বাহিরে আসিল, সেই মুহূর্ত্তে গৃহখানা পড়িয়া গেল; অগ্নি দ্বিগুণ জোরে গর্জ্জিয়া উঠিল।

সিরাজের সর্ব্বাঙ্গ অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসাইয়া গিয়াছিল। সে নিজের জ্বালা অগ্রাহ্য করিয়া আগে রহিমার সেবায় মনোনিবেশ করিল। রহিমা বড় সাংঘাতিক পুড়িয়াছে, সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। সিরাজের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে এত ডাকিল, কিন্তু রহিমার কোন সাড়া শব্দ সে পাইল না।

নিষ্পলক নেত্রে সে রহিমার মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিয়া পাইতেছিল না এখন সে কি করিবে।

সামনে তাহার আপনার বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়া তাহার গৃহ দুইখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

প্রভাতের আলো পূর্ব্বদিক রঙ্গিন করিয়া তুলিল; সিরাজ তখনও রহিমার পাশে বসিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে। বাড়ীর কাছাকাছি অনেক হিন্দুর বাস, কিন্তু ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, কেহই তাহার সাহায্যার্থে আসিল না। তাহার প্রতি সহানুভূতি কাহারও ছিল না। যাহাদের সহানুভূতিতে সিরাজের পূর্ব্বপুরুষ এই স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই আজ ছিল না।

সিরাজ ভগিনীকে একা রাখিয়াই ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। ডাক্তার বাবু তখন বারাণ্ডায় মুখ ধুইতেছিলেন; সিরাজ একেবারে পাগলের মত গিয়া পড়িল—তাঁহাকে এখনই যাইতে হইবে, নচেৎ সে বোনটীকে জন্মের মত হারাইবে!

মতি বোস জমীদারের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'তুমি যাও, আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।'

সিরাজ গোপনে চোখ মুছিল। সে সবই জানিতেছিল, জানিয়াও সে এই ডাক্তারের পদতলে আবার কুকুরের মতই লুটাইয়া পড়িল। বিরক্ত ডাক্তার বলিলেন—তিনি চা না খাইয়া একপাও চলিবেন না।

গাছতলে মুর্চ্ছিতা ভগিনীকে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সিরাজ আর বিলম্ব করিল না, রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল। আর না, খোদা,

আর না! যথেষ্ট সহ্য করিয়াছে সে, তোমার গোলামকে আর একটু শক্তি দাও যে পর্য্যন্ত না সব শেষ করিতে পারে। দীন দুনিয়ার মালিক তোমারই ইচ্ছায় পূর্ণ হইবে।

সামনের বড় গাছটার আড়ালে তখন সূর্য্য উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহার রক্তিম আলো রহিমার পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সিরাজ তাহার পার্শ্বে নতজানু হইয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, 'রহিমা, একবার একটী শেষ কথা বলে যা বোন, যা আমার সারা-জীবনের সম্বল হয়ে থাকবে। একটীবার চেয়ে যা দিদি—'

চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল রহিমার ললাটে পড়িয়া ঠিক মুক্তার মত জ্বলিতে লাগিল।

বোধ হইল রহিমার ওষ্ঠ একটু কম্পিত হইল, অতি কষ্টে একবার সে চাহিল। সোৎসুকে সিরাজ বলিল, 'কি দিদি?'

বড় কষ্টে রহিমা উচ্চারণ করিল 'জল—'

জল নিকটে, কিন্তু পাত্র কোথায়? হিন্দু অধিবাসীরা পাত্র দিবে না। সিরাজ নিজের বসনপ্রান্ত জলে ভিজাইয়া আনিয়া ভগ্নীর মুখে দিল।

রহিমার দুই চোখ দিয়া নীরবে অশ্রুধারা ছুটিয়া সিরাজের কোলটাকে সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। সিরাজ সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। ললাটে যে বড় ফোস্কাটা হইয়াছিল তাহার হাত লাগিয়া সেটা গলিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া

পড়িল, রহিমা চোখ মুদিল। সাগ্রহে সিরাজ বলিল, 'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে দিদি ?'

রহিমা উত্তর দিল না। আর একটা কথাও সে কহিতে পারিল না, আর সে চাহিল না, জ্যেষ্ঠের স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে সে চক্ষু মুদিল।

সিরাজ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার চোখে আর এক বিন্দুও অশ্রু ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে কি তরঙ্গ উঠিতে ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সমস্ত দিন চলিয়া গেল, তখনও সিরাজ সেই ভাবে সেইখানে বসিয়া। বৈকাল বেলা নিজেই সে উঠিল, নিজেই সেই ক্ষুদ্র দেহ সমাহিত করিয়া সেইখানেই আবার আসিল।

কাল তাহার সব ছিল; গৃহ ছিল, স্নেহময়ী ভগিনী ছিল, আজ তাহার কেহ নাই, কিছু নাই! আজ সে দাঁড়াইবে কোথায় আজ তাহার দগ্ধচিত্তে শান্তিধারা ঢালিয়া দিবে কে ?

তারানাথবাবুর আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার পরম শত্রু সিরাজ খুব জব্দ হইয়াছে, আর তাহার মাথা উঁচু করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যদি রহিমা না মরিয়া সিরাজ মরিত তাহা হইলেই কাজটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

দু'দিন বাদে একদিন সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে এই কথাই চলিতেছিল। বৈঠক খুব জমিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় সিরাজ সেই গৃহের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিবামাত্র স্বয়ং জমীদার পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন, সকলেই সন্ত্রস্ত—সচকিত হইয়া উঠিল।

সিরাজ মাথা নোয়াইয়া গম্ভীর বচনে বলিল 'আপনাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। ভগবান আমায় সহ্যশীল করেছেন, অধৈর্য্য করেন নি, তাই একমাত্র স্নেহময়ী বোনের শোকও আমি সামলেছি। হীন প্রতিহিংসার দ্বারা আমি আমার ঘৃণিত বৃত্তিকে চরিতার্থ করতে চাইনে। যার জন্যে আপনি এই জঘন্য নারীহত্যা পর্য্যন্ত করলেন, আমি তা স্বয়ং আপনাকে দান করতে এসেছি আশা করছি এতে আপনি সুখী হবেন। দয়াময় খোদা কৃপা করে আমাকে ফকির সাজ দেছেন, আমি ভিক্ষা করে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করতে পারব, সঞ্চয় কিছু করতে চাইনে।'

তাহার হাতে যে দান-পত্রখানা ছিল, দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া সেখানা তারকনাথ বাবুর সামনে রাখিয়া একটা সেলাম দিয়া সে তেমনি ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

যে বাগান পুষ্করিণীর জন্য এত কাণ্ড তাহা সহজেই তারানাথ বাবুর হাতে আসিল, কিন্তু তিনি ইহাতে একটুও সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এই ত্যাগীর ত্যাগ স্বীকার এমন একটা ধাক্কা লাগিল যাহা বলবার নহে।

ইহার পর তিনি সেই বাগান ও পুষ্করিণী দিয়া নিজে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সিরাজকে আবার গৃহবাসী করিবার জন্য তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনে কখনও সেই ত্যাগী ফকিরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সে ভিক্ষা করিতে করিতে পবিত্র স্থান মক্কার পথে চলিয়াছে।

শেষ

প্রভাবতীদেবী সরস্বতীর

চলার পথে	২৲
প্রতীক্ষায়	২।০
পথের সম্বল	২।০
জীবন সঙ্গিনী	১॥০
গৌরী	১।০
ধ্রুব তারা	১৲
গৃহলক্ষ্মী	১৲
মরুর পথে	২৲
দারিদ্র্যের ইতিহাস	২৲
লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা	১॥০

নরেন দেব, প্রবোধ কুমার সান্যাল, আশালতা সিংহ ও প্রমুখ ক'জনের

অষ্টমী	২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

রূপবতী	২৲
রায়চৌধুরী	২৲

ভারতের প্রথিতযশা যৌন বিজ্ঞানিক
নৃপেন্দ্রকুমার বসুর

প্রেম ও কাম বিজ্ঞান	**১॥০**
নর-নারী যৌন বোধ	২৲
যৌবনের যাদুপুরী	১৲
যৌন বিশ্বকোষ, প্রতিখণ্ড	৸০

(১।২।৩ খণ্ড বাহির হইয়াছে)

সন্তরণ পরিচয় (শান্তি পাল)	৸০

উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—
সোনালী রঙ

কাত্যায়নী গোয়েন্দা গ্রন্থমালা

পিশাচ তান্ত্রিক খুনী	॥৵০
দস্যু-কন্যা	॥৵০
দাগাবাজের গৈবী চাল	॥৵০
খুন দরিয়া অথৈ জলে	॥৵০
কাটামুণ্ডুর কারসাজি	॥৵০
জালিয়াতের জটিল জাল	॥৵০
মরণ গোলাপ	॥৵০
শয়তানে আর সুন্দরীতে	॥৵০
শমন সভার কীর্ত্তি	॥৵০
পত্র পকেটে, সদ্য খুন !	॥৵০

রক্তপায়ী সবুজ মোটর—॥৵০

কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকালী প্রেস, কলিকাতা।